ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র

সুপ্রিয়া সেনভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৬

আমার পরমশ্রদ্ধেয়

পিতামহ শ্রীপরেশচন্দ্র সেন

এবং

মাতামহী শ্রীমতি বিরজাবাসিনী দেবীর

স্মরণে

'উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি
উঠ মা
এবার সুসন্তান হইব
সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব···
এবার আপনা ভুলিব
ভ্রাতৃবৎসল হইব
পরের মঙ্গল সাধিব
অধর্ম্ম আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব
উঠ মা
একা রোদন করিতেছি
উঠ মা'

সূচী

ভূমিকা

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে ১৩২ বছর আগে। 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ'কে (১৮৬৪) যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা বলে ধরে নিই তবে এই কালসীমা আমরা পাবো। ভারতের ইতিহাসে এই ১৩২ বছরের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কোনো রকম সরলীকরণ না করে এই সময়টিকে আমাদের স্বাদেশিকতার যুগ বলা যায়। স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশচিন্তা, স্বাজাত্যবোধ এই সময়ে আমাদের প্রধান বৃত্তি হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এর সূচনা হয়েছে। মধ্যভাগ থেকে বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। সবশেষে এই বোধ ভারতের ইতিহাসের এক চূড়ান্ত পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে। বস্তুত স্বাদেশিকতার দিক থেকে সিপাহীবিদ্রোহের তেমন কিছু তাৎপর্য থাকুক বা না থাকুক তবু কালক্রমে এই বিদ্রোহের পঞ্চাশবৎসরের মধ্যেই এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের অবতারণায় সক্ষম হয়েছিল ভারতবাসী এবং নব্বইবৎসরের মধ্যেই ইংরেজ-অধীনতা থেকে মুক্তিও অর্জিত হোল।

এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের যতটুকু গর্ব করবার বিষয় তার অধিকাংশের সঙ্গে স্বদেশচিন্তার কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে আছে। অন্যদিকে স্বাধীনভারতে সম্প্রতি আমাদের যেখানে যতটুকু পরিতাপও করতে হচ্ছে তার কারণও ঐ স্বাজাত্যবোধেরই কোনো-না-কোনো বিকৃতি। স্বদেশচিন্তা বিগত প্রায় সার্ধশতবর্ষ জুড়ে এদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বজনের নিত্যনিরীক্ষার অন্যতম বিষয়। স্বদেশচিন্তা কখনো আমাদের চেতনায় আন্তর্জাতিকতায় সম্প্রসারিত হয়েছে। কখনো জাতিপ্রেম, ভাষাপ্রেম বা ধর্মপ্রেমে সীমাবদ্ধ হয়ে আমাদের বিব্রত, খণ্ডিত বা সংকুচিত করেছে। কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয়রা এতো দীর্ঘকাল আর কখনো এ পরিমাণে উদ্বেলিত হয়েছিল কি না সে এক দুরূহ প্রশ্ন।

রামমোহনের কালে একটিমাত্র মানুষের সামান্য দু-একটি প্রতিবাদপত্র থেকে মধ্যবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তার যে সমুদ্রপ্রমাণ বিস্তার ঘটতে পারলো তার পেছনে এদেশের একাধিক সাহিত্যিক, দার্শনিক ও দেশহিতৈষীর চিন্তন,

মনন ও স্বজনের প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান এ বিষয়ে বিশেষতম এবং উজ্জ্বলতম। বঙ্গদেশে তো বটেই পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রভাব পড়েছিল। এই আলোচনায় আমরা বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তানায়কদের স্বদেশচিন্তার একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাসূত্রসমূহকে বিশেষভাবে অবলোকন ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি।

দুই

তবে এ বিষয়ে একটি সীমা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মূলত সাহিত্যিক। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা যতো উচ্চস্তরেরই হোক না কেন সেই চিন্তার শুধুমাত্র শুষ্ক ও তাত্ত্বিক প্রখরতার মধ্যে এই আলোচনাকে আমরা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনি। বরং স্বদেশচিন্তার সাহিত্যরূপায়ণের দিকে আমাদের বেশি মনোনিবেশ করতে হয়েছে। কেন হয়েছে তার অন্য একটি হেতু এখানে বলে রাখা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি নামের একটি অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে ধর্মতত্ত্বের গুরু স্বদেশপ্রীতিকেও এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। বলেছেন 'স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম'। ধর্মতত্ত্বের সূচনা যে অসাধারণ প্রশ্নটি সামনে রেখে হয়েছে এখানে আমরা তা মনে করে নিতে পারি। গুরু বলেছেন 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এ প্রশ্ন উদিত হইত এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতনামা সমালোচকদের সঙ্গে একমত হয়ে এখানে আমরাও এই জিজ্ঞাসাটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব জিজ্ঞাসা বলেই ধরে নিতে পারি। ধর্মতত্ত্বে দেখছি বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কিত এই প্রশ্নের একটি উত্তরও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধর্মতত্ত্বের চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ে সে উপলব্ধির কথা বলা আছে। আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি সে অনুভব শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়। দেশ-কাল—লোকহিত বর্জন করে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনযাপন সম্ভব হয় না। 'রাজসিংহ' উপন্যাস, 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', এবং আরও দু-একটি প্রবন্ধেও তার প্রমাণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য স্বদেশপ্রীতিকে বর্জন করে ইতিহাসে বা পুরাণে কোথাও পূর্ণ হয় না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন 'দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম' এবং এই গুরুতর ধর্মকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনে কখনো লঘুভাবে

দেখেন নি। বরং এই বিষয়টি তাঁর জীবনের সব থেকে গূঢ় যন্ত্রণা ও উদ্দাম প্রেম সঞ্চারিত করবার বিষয়; তাই শুধুমাত্র ঐ শেষ স্বীকৃতিতে নয়, তাঁর অধিকাংশ রচনাতেও আমরা এই প্রবণতার প্রবলরকমের উপস্থিতি পাই। এজন্যই আমরা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন ধরে মুখ্যত স্বদেশচিন্তাই করেছিলেন। তাঁর 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতা'র যে পথ তিনি ধর্মতত্ত্বে নির্ধারণ করেছিলেন, সে বৃত্তিসমূহের প্রধানতম তিনিই ভেবেছেন দেশরক্ষাকে। শুধুমাত্র শেষ স্বীকৃতিতে নয় তাঁর অধিকাংশ রচনাতেও আমরা এই প্রবণতার প্রবলরকমের উপস্থিতি পাই। এমনকি আনন্দমঠে নিজের কল্পিতঈশ্বরের সঙ্গেও তিনি দেশমাতাকে অর্ধাংশে মিশিয়েছেন। তাই তাঁর পথও 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'র পথ নয়। উপন্যাসে তাঁর সন্ন্যাসীরা এ জন্যই দেশোদ্ধার বা লোকহিতে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। এমন কি 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'ধর্মতত্ত্ব' সর্বত্র যখনই তিনি দেবলোকের নিকটস্থ হয়েছেন তখনই নরলোকের দিকে তাঁকে দৃষ্টি ফেলতে হয় এ কারণেই।

তাঁর সাহিত্যজীবনে অবশ্যই বিচিত্র সুর বেজেছিল। কিন্তু সমস্ত সুরের বর্ণচ্ছটার অন্তরালে যে গহনতম এবং প্রধানতম সুর আমরা বঙ্কিমসাহিত্যে শুনতে পাই তা স্বদেশপ্রীতির। এ জন্যেই নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদনে তিনি 'সৌন্দর্যসৃষ্টি'র আগেই 'দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন'-এর কথা বলেন। নিজেও তিনি এই কাজই করতে চেয়েছেন। তাই এই পরামর্শ এ ভাবে না লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপায় ছিল না।

তবে এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলা একরকম, কিন্তু শিল্পে বা সাহিত্যে এর রসরূপায়ণ অন্য রকমের কাজ। বস্তুত লক্ষ্যনির্ধারণ থেকে অনেক কঠিন কাজই বটে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে, যা হলে সমাজের ও দেশের ভালো হয়, সে সুবিবেচনার সঙ্গে, যা হলে শিল্প রসোত্তীর্ণ হয়, সে শিল্প-তৃষ্ণার প্রায় নৈমিত্তিক দ্বন্দ্ব ঘটেছে। তাঁর উপন্যাসসমূহের অন্দরমহলের এই দ্বন্দ্বটি এবং এ জাতের অন্যান্য নানা প্রকারের সাহিত্যকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহই এখানে আমাদের অন্তত উপন্যাস অংশের মূল আলোচ্য বিষয়। আমরা মনে করেছি এই দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার প্রসঙ্গসমূহই বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝে নেবার উপযুক্ত অঞ্চল। বঙ্কিমচন্দ্র কি উপায়ে একটি একটি করে সীমাবদ্ধতার স্তর পেরিয়ে যান, তা আমরা এই সব আলোচনাতেই বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। তবে স্বদেশচিন্তা যেখানে মননে, তথ্যে ও যুক্তিশৃঙ্খলায় স্পষ্ট ও বিশিষ্ট সে সব

অঞ্চলের আলোচনা আমরা প্রবন্ধের প্রসঙ্গে যথাসম্ভব করেছি; কিন্তু উপন্যাসের প্রসঙ্গে স্বদেশচিন্তার প্রাণসঞ্চারণ ও রসরূপায়ণ এবং সে প্রচেষ্টাসমূহের পরিণাম অবলোকন করার চেষ্টা আমরা বিশেষভাবে করেছি।

তিন

'স্বদেশচিন্তা' শব্দটি সম্পর্কেও একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। Nationalism কথাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন 'জাতিপ্রতিষ্ঠা'। বলেছেন 'জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে' ('ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা')। স্বদেশচিন্তা শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখিনি। শেষজীবনে 'স্বদেশপ্রীতি', 'স্বদেশরক্ষা' এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই গবেষণানিবন্ধের শিরোণামে স্বদেশচিন্তা শব্দটি থেকে একটু বৃহত্তর প্রত্যাশার সূচনা হতে পারে। মনে করা যেতে পারে স্বদেশবিষয়ক যে সমস্ত চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর পূর্বসূরিরা করেছেন আমরা এখানে তারই আলোচনা করবো। সেভাবে একটু বিস্তারিতভাবে ধরা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' সম্পর্কিত প্রবন্ধ, 'সাংখ্যদর্শন' সম্পর্কিত আলোচনা বা 'উত্তরচরিত'-এর বিষয়ে অসাধারণ বিশ্লেষণ সবই এক অর্থে স্বদেশ-বিষয়ক-চিন্তা। কিন্তু আমরা ততোটা বিস্তার ঘটিয়ে স্বদেশচিন্তা বিষয়টিকে ভাবিনি। আমরা মনে করেছি স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশ-বিষয়ক-চিন্তার মধ্যে বিষয়গত কিছু মিল থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য আছে। স্বদেশচিন্তা শুধু বিস্তারে ছোট নয় তার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অনুস্যূত থাকে। আমরা মনে করি স্বদেশ-চিন্তা একটি মননক্রিয়ার নাম যার গতি বিচিত্র কিন্তু লক্ষ্য প্রায়শই একমুখী। এই স্বদেশচিন্তা থেকেই প্রকৃত অর্থে স্বাদেশিকতার স্ফুরণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে স্বদেশ-বিষয়ক-চিন্তায় সাংখ্যদর্শনও হয়তো অন্তর্ভূক্ত হয়, কিন্তু আমরা ততো দূরবর্তী বিষয়ে সূত্রযোজনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। প্রাসঙ্গিক বিষয় যেখানে প্রচুর এবং যথেষ্ট সেখানে ততো দূরসন্ধানী হবার কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিনি। সর্বোপরি আমরা মনে করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরিরা এদেশে নানামুখীন স্বদেশচিন্তা করেছেন এবং সেই চিন্তন পরবর্তীকালে আরও সুগ্রথিত, সুনির্মিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে আমাদের স্বাদেশিকতায় পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রহকর্ম, এই প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ ও নির্মাণের দিকে আমরা বেশি ঝোঁক দিয়েছি। আমাদের এই অভিপ্রায়

থেকে স্বদেশচিন্তা কথাটিকে বুঝে নিলে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যটি বোঝা যাবে।

চার

আলোচনাটিকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথমে স্বদেশচিন্তা, বিশেষ করে স্বদেশিকতার অর্থ, উৎস, ও ইতিহাস নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা রেখেছি (প্রথম অধ্যায়)। আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরিদের স্বদেশচিন্তার বিচরণক্ষেত্রসমূহের একটি সমীক্ষা করবার চেষ্টা করেছি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। বাঙালির সাহিত্যে, সমাজচিন্তায়, শিক্ষাসংস্কারে, ধর্মান্দোলনে ও লোকহিতকর্মে স্বদেশচিন্তার যে অগণিত তরঙ্গ তখন প্রতিনিয়ত উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল, তার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন ও প্রবণতা নির্ধারণের চেষ্টা এই পর্যায়ে ঘটেছে। তৃতীয় ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বদেশচিন্তার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে—(তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চম অধ্যায়)। স্বাভাবিক কারণেই এই পর্যায়ে দীর্ঘতম আলোচনা হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে নিয়ে। চতুর্থ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে স্বদেশচিন্তার একটি মূল্যায়ন করবার চেষ্টা হয়েছে। এই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার যে অভিযোগ তার বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। এই আমাদের আলোচনার ক্রমপর্যায়।

পাঁচ

এই গবেষণাপত্র আদৌ ছাপানো যাবে কি না এ নিয়ে আমার বরাবরের দুশ্চিন্তা ছিল। আজকাল পুস্তকের বাজার প্রবন্ধবিমুখ তার উপরে আবার অপরিচিত লেখিকার গবেষণা! আমার এক প্রিয় অধ্যাপিকার কাছে খবর পেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দ্বারস্থ হলাম। ওঁদের বিশেষজ্ঞরা আমার গবেষণাপত্র পড়ে, আমাকে একেবারে অবাক করে, এই লেখা ছাপানোর জন্য সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই চিঠি পাবার পর আমি যখন বাইরের প্রকাশকদের সঙ্গে পরমোৎসাহে কথাবার্তা চালাচ্ছি তখন আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক হতে হল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তাঁরা নিজেরাই এই গবেষণাপত্র ছাপবেন। কী আনন্দের যে ব্যাপার। জীবনে এ রকম মুহূর্ত আমার কমই এসেছে। এ এক দুর্লভ আশীর্বাদ।

ছাপা শুরু হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে। এক ফর্মা হাতে পাবার পর ধীরে সুস্থে প্রুফ দেখে জমা দিতে গিয়ে দেখি আরও তিন ফর্মা কম্পোজ হয়ে গেছে। সেই তিন ফর্মা ফেরত দিতে গিয়ে আরও পাঁচ। কোথায় আমি তাড়া দেবো তার বদলে দেখি আমাকেই তাড়া দিচ্ছেন প্রেসের কর্মীরা, বিশেষ করে এক সদালাপী ভদ্রলোক। এমন সব ছোটখাট ভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছেন যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। এই কাজের সূত্রে আলাপ হলো অসাধারণ এক কর্মবীর ব্রজেন্দ্রকুমার দেবাচার্যের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ কর্মী। এই ভদ্রলোকের শরীরে যে কালান্তক সব ব্যাধি বাসা বেঁধেছিলো কে জানতো! অকস্মাৎ তাঁর অকালমৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাহত। এই সদাশয় মানুষটি, তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দ এবং তাঁদের অধীক্ষক শ্রী প্রদীপকুমার ঘোষের স্বতোপ্রণোদিত সপ্রতিভ তৎপরতায় আমার বইটি দ্রুত ছাপা হল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কৈশোর কাল থেকেই আমার প্রিয় লেখক। এই কাজটির সূত্রে এই লেখককে আমি যেন নতুনভাবে চিনে ওঠার সুযোগ পেলাম। আমার অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ কাজে আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও ডাঃ অনুপ মজুমদার, আমাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী অলকা আহমেদ ও অধ্যাপিকা সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান অধ্যক্ষা ডঃ দীপ্তি বিশ্বাস এ কাজে আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়াও যাঁদের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা, প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও উৎসাহ ছাড়া আমার এ কাজ কখনই সম্পূর্ণ করতে পারতাম না তাঁরা হলেন শ্রী মনোজকুমার সেন, শ্রীমতী সবিতা সেন, ডঃ রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ খনা মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রমীলা ভট্টাচার্য, ডঃ সঙ্ঘমিত্রা সেনচৌধুরী। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজ,
বাংলাসাহিত্য বিভাগ,
বৈশাখ, ১৪০৩।

সুপ্রিয়া সেনভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

স্বদেশ : স্বাদেশিকতা : স্বদেশচিন্তা

স্বাদেশিকতা কথাটি একটি ইংরেজি শব্দের অনুবাদ। Nationalism-কে আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, সম্ভবত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্লাবনের সময় স্বাদেশিকতায় অনূদিত করেছি। শব্দটি বাংলায় নতুন কিন্তু বোধটি এদেশে নতুন নয়। Nationalism আমাদের চিন্তায় এসেছে অনেক আগেই। সে ইতিহাস পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করবো।

স্বাদেশিকতা না পেলেও স্বদেশ শব্দটি আমরা চাণক্যশ্লোকে[১] পাই। স্বদেশ শব্দটি মহাভারতেও আছে।[২] আছে মণুসংহিতায়।[৩] বস্তুত সভ্যতার যে স্তরে সীমানির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বিষয়টি সমাজে স্বিবীকৃত হয়েছে সে সময় থেকেই স্বদেশ বোধটি হয়তো সমাজে আছে। তবে স্বদেশ শব্দের উল্লেখ থাকলেও স্বাদেশিকতা বা স্বদেশচিন্তা বলতে আমরা আজ যা বুঝি তার পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে এদেশে পাই না।[৪]

য়ুরোপেও State কথাটি আমরা খুব প্রাচীনকালে পাই না। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীর এক বিখ্যাত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক Niccolo Machia Velli তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থে (The Prince—1513) State বা রাষ্ট্রসম্পর্কিত ধারণাকে প্রথম জনসমক্ষে প্রচার করেন। এর আগে আমরা এখন দেশ বা রাষ্ট্র বলতে জনসাধারণ, সরকার ও আইনকানুন মিলিয়ে যা বুঝি সেরকম ধারণা য়ুরোপেও ছিল না। তবে দেশাত্মবোধের কিঞ্চিৎ দূরবর্তী কিছু বিষয় তখনো ছিল যদিও তার সঙ্গে আজকের দেশ সম্পর্কিত ধারণার সামান্যই মিল আছে। যেমন গ্রীকরা ভিন্ন ভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে বাস করতেন। তার নাম ছিল Polis। পলিস (Polis) কথার অর্থ—একটি নগরকেন্দ্রিক জনসমষ্টি। ক্ল্যাসিকাল ল্যাটিনে আবার পরিচয়াত্মক শব্দটি আলাদা। Cicero বলেছেন respublica-র কথা। এই শব্দটির অর্থও গ্রীক Polis থেকে ভিন্নতর। রিপাব্লিকা কথাটির মানে এমন একটি জনসমষ্টি যারা একসঙ্গে, মিলিতভাবে সম্পদরক্ষা করে চলেন। এ ছাড়াও ল্যাটিনে 'Civitas' কথাটিও ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির অর্থ—'Community of Citizens'।

এই সমস্ত নামকরণের মধ্যে আমরা যেন ইতিহাসের এক প্রচ্ছন্নগতিকে অনুভব করতে পারি। দেখতে পাই, মানুষের বাসস্থলের নামকরণ নানাক্ষেত্রেই হয়েছে সেকালীন সামাজিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন আমাদের দেশের 'গ্রাম' ও 'নগর' শব্দ দুটি। গ্রাম কথার প্রাথমিক অর্থ—'যেখানে ভোগী ভোগ্য গ্রাস করে', তারপরের অর্থ—'লোকের গমনস্থান'[১]। 'শুক্রনীতিসার' গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে—'একক্রোশ পরিমিত ও সহস্র রৌপ্য মুদ্রা রাজস্ব ভূভাগ' (১. ১৯৩) হচ্ছে গ্রাম। ভাগবতটীকায় বলা হচ্ছে 'বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসন্তি তে। স তু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এব চ॥' এখানেও সম্ভবত ইতিহাসের বিবর্তনকে অনুভব করা যায়। একই বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য যুগে যুগে পাল্টায়। একারণেই পূর্ববর্তী সমাজের নামকরণ অনেক সময় পরবর্তী সমাজে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক বলে মনে হয়েছে। যেমন গ্রীক 'Polis' শব্দটি বলতে সে যুগে ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বোঝানো হোত। এমনকি 'Polis' শব্দটির অর্থের মধ্যে নগররাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বিষয়টিও অনুস্যূত থাকতো।[২] পরবর্তীকালে য়ুরোপে যখন ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো, যখন চার্চ বনাম ষ্টেট এই সংঘাত শুরু হলো, তখন 'Polis' শব্দটি তার বহু-অর্থ-ধারণ-ক্ষমতার জন্যে বর্জিত হলো। অর্থাৎ বিবর্তনের ফলে যখন দেশসম্পর্কিত অবস্থা, ধারণা ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটে তখন সেই নতুন চিন্তার পরিচিতি দেবার জন্য নতুন শব্দও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। দেশাত্মবোধক ভাবধারার রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও এই শব্দাবলীর পরিবর্তনের সূত্রে ধরে বেশ অনুধাবন করা যায়। এবং এই অনুধাবনকর্মের শেষে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশে এবং বিদেশেও স্বদেশ বলতে আমরা এখন এই গণতান্ত্রিক এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যা বুঝি সেই বোধটি মধ্যযুগে ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। এ অবস্থায় ইংরেজরা আসবার আগে ভারতবর্ষে স্বদেশ বলতে কি বোঝাতো এই প্রশ্নটির একটু আলোচনা প্রয়োজন।

অনুমান করি, রাজা মহারাজাদের যুগে, রাজার কাছে হয়তো স্বদেশ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদের মতো একটি বিষয় বোঝাতো। কিন্তু প্রজার কাছে? সাধারণ মানুষের কাছে? তাঁদের পক্ষে স্বদেশ বলতে কি একই বিষয় বোঝা সম্ভব ছিল? মধ্যযুগ থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত ইতিহাসে কখনো কখনো দেখা গেছে যে প্রজারা, দেশের নাগরিকেরা, দেশরক্ষার জন্য বিদেশী বা বহিরাগত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। মরাঠা এবং রাজপুতদের বীরত্বের গল্প

ইতিহাসে খুব কম নেই। বাংলায় সেই বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গল্প-উপন্যাস তো বটেই কবিতাও কম নেই। তবে শুধু বাংলা কেন পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বত্র এই বীরত্বের জয়গান মিলবে। কিন্তু শিবাজীর সৈনিক বা রাণাপ্রতাপের সৈনিকের দেশপ্রেম এবং ক্ষুদিরাম বা ভগতসিংহের দেশপ্রেম কি একই বস্তু? একই চারিত্রিক আবেগ কি এই দুই পক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল?

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের দু-একটি সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে সাধারণের ধারণা মরাঠারা দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং শিবাজীর নেতৃত্বে তাঁরা মোগলের বিরুদ্ধে স্বদেশরক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন। মরাঠাদের চরিত্র সম্পর্কে শ্রী যদুনাথ সরকার মহাশয় চৈনিক পরিব্রাজক Yuan Chwang এর এক মূল্যায়ন 'Shivaji and his times'[৭] পুস্তকে উদ্ধার করেছেন। সেই পণ্ডিত পরিব্রাজক লিখেছেন—"The inhabitants are proudspirited and warlike, grateful for favour and revengeful for wrongs, self-sacrificing towards suppliants in distress and sanguinary to death with any who treated them insultingly."

চৈনিক পরিব্রাজকের এই মূল্যায়ন যথার্থ কি না জানিনা। তবে যে জাতি proudspirited তাঁদের কি স্বজাতিপ্রিয় বলবো নাকি স্বদেশবৎসল বলবো? নাকি গোয়ার ও বদরাগী বলেই বুঝতে হবে! তবে কি হিংস্র এক মরাঠা জাতির চারিত্রিক ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আনুকূল্য পেয়েছিলেন শিবাজী! তবে এক উদারতর দেশপ্রীতির পরিচয় পাই আমরা সংযোজিত শিবাজীর পত্রটিতে (দ্র-টীকা ৪)। দেশের প্রায় সমস্ত মানুষের হিতার্থে এখানে এক ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও মহৎ যুক্তি তিনি ঔরঙ্গজেবের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু এরকম তথ্য থেকে মধ্যযুগের দেশ যে রাজারই দেশ সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা স'রে যেতে পারিনা।

এ কথার প্রমাণ আছে বঙ্গদেশের ইতিহাসেও। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বলেছেন বখ্‌তিয়ারের নিষ্প্রতিরোধ বঙ্গবিজয় সে যুগে বঙ্গদেশে 'রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম'[৮]। অর্থাৎ রাজা যেখানে অপদার্থ, সুশাসনে অক্ষম, সেখানে সে যুগে জনগণ অপরিচিত নতুন রাজাকে (জনগণ বলতে এখানে আমরা রাজার সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র, নগরবাসী এই সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেও বোঝাচ্ছি।) স্বীকার করতেও পরাঙ্মুখ হতেন না। অর্থাৎ

রাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের স্বদেশ বলে কিছু ছিল না। দেশ ছিল রাজার। মানুষের গোষ্ঠী ছিল। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং অনৈক্যও ছিল। কিন্তু স্বদেশ, স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রেম এইসব শব্দের আজ যে অর্থ আমরা বুঝি সেই অর্থ সেকালে মানুষের কাছে ঐতিহাসিক কারণেই স্পষ্ট হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ভূস্বামী বীরেন্দ্র এবং অভিরাম স্বামীর সংলাপে এই বিষয়টির একটি জীবন্ত চেহারা পাওয়া যেতে পারে। মোগল নাকি পাঠান কোন পক্ষে বীরেন্দ্র যোগ দেবেন তা নিয়ে গুরু শিষ্যের আলাপ লিখেছেন প্রখর ঐতিহাসিক বোধসম্পন্ন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র—

> "বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন ?"
>
> অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।"
>
> বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজা কে ? মোগল পাঠান উভয়েই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।"
>
> অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।"
>
> বী। আকবর শাহা ?
>
> অ। "অবশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভূস্বামীর কাছে ধর্মত তিনিই রাজা যিনি করগ্রাহী। কত অনুভূতিহীন ও শুষ্ক এই সংলাপ! দেশ এখানে অপরের সম্পদের মতো দূরবর্তী ও অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় শুধু নিজের নিরাপত্তা আর হয়তো ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা। মূলত এইসব সংলাপ থেকে মনে হয় দেশ, দেশশাসক, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি শব্দের মধ্যে যে আগুন বর্তমান যুগে ফরাসী বিপ্লবের পর সংযোজিত হয়েছে, সেযুগে তা ছিল একেবারেই অভাবিত। তাতে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কোন যোগ ছিল না। এমনকি মাঝারি ভূস্বামীদেরও না।

॥ দুই ॥

স্বাদেশিকতার উদ্ভব সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দুটি মত উল্লেখ করবার মত। একটি মতের প্রবক্তা Hans Kohn ; তিনি তাঁর 'Nationalism its

Meaning and History' গ্রন্থে বলছেন স্বাদেশিকতা হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থার নাম। এই অবস্থায় মানুষের সম্পূর্ণ আনুগত্য থাকে তাঁর স্বদেশের প্রতি।[৯] তিনি বলছেন স্বাদেশিকতার শিকড় আছে প্রাচীন হিব্রু এবং গ্রীক সভ্যতায়। প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক ভাবে অন্য জাতি থেকে পৃথক ;—এ পার্থক্য সেই জাতির মধ্যে একটি গোষ্ঠী ঐক্যের সূচনা করে। প্রাচীন যুগে দেশ সম্পর্কিত ধারণা না থাকলেও প্রত্যেক গ্রীক, হিব্রু বা বার্বারিয়ান্সদের একটা শক্তিশালী 'Consciousness of a cultural mission' ছিল। এই উপলব্ধিই বিকশিত হয়ে আজকের 'Nationalism' বা স্বাদেশিকতায় পরিণত হয়েছে বলে Kohn বিশ্বাস করেন।

ইংলণ্ডে আধুনিক Nationalism-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। মিলটনের (১৬০৮–১৬৭৪) লেখায় স্বাদেশিকতার আধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রথম ধরা পড়ে। সে যুগে চার্চ এবং রাজতন্ত্রের পেষণে ক্লীষ্ট মানুষের সামনে দার্শনিক কবি মিলটন একটি নতুন কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন দাসত্ব ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির কথা। কাছাকাছি সময়েই Oliver Cromwell (1599-1658) বললেন 'Liberty of conscience and Liberty of the Subject-এর কথা। ফরাসী বিপ্লবে এ-সব স্বপ্নের একটি বাস্তব রাষ্ট্ররূপ প্রতিষ্ঠিত হল। দেশের উপরে রাজার একমাত্র অধিকার সেখানে অস্বীকৃত হল এবং তার পরিবর্তে দেশের উপরে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। পৃথিবীতে স্বাদেশিকতা সম্পর্কিত চিন্তা ফরাসী বিপ্লবের সূত্রেই সর্বত্র একটি গতি লাভ করলো। এবং সেই ঘটনার গতি ধরেই সমস্ত পৃথিবীতে স্বাদেশিকতার প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন অধ্যাপক R. S. Chavan, তিনি লিখেছেন—'In 19th Century it became a general European movement, and in 20th it has become one of the most explosive political philosophies that rule the world today'.[১০]

এই উক্তির সঙ্গে আমরা অনেকাংশে একমত। বস্তুত বিগত একশ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে এককথায় স্বাদেশিকতার জয়যাত্রার ইতিহাস। প্রায় সমগ্র এশিয়া এবং তিন চতুর্থাংশ আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ এই সময় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে

প্রসারিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্বাদেশিতার বোধ সমূহও। এই যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরাও তাঁদের স্বাদেশিকতার জন্যেই শ্রেষ্ঠ। কোনো ধর্মপ্রচার করে নয়, দার্শনিক মতবাদের জন্যেও নয়, এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষরা তাঁর নিজের দেশকে ভালোবাসার সূত্রেই শ্রেষ্ঠতম হয়েছেন। এ যুগের কোনো বড় কবি বা ঔপন্যাসিকও এই বোধকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। অন্যদিকে স্বাদেশিকতার এই সামর্থ্যের এমনই পরিহাস যে এ যুগের নিকৃষ্টতম মানুষটিরও জার্মানীতে স্বাদেশিকতার বিকৃতি ঘটিয়েই ঐ বিপুল জনসমর্থন ও ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছিল। বস্তুত এক অর্থে স্বাদেশিকতার মধ্যে যেমন ভালোবাসা ও উদারতার সম্ভাবনা আছে তেমনি সংকীর্ণতার ঝোঁকও আছে। এ যুগ উদারতা পেয়েছে অনেক। আবার বেইরুটে, পাঞ্জাবে, আফগানিস্থানে ও শ্রীলঙ্কায় মানুষ স্বজাতিপ্রেমের সংকীর্ণতারও সম্মুখীন হয়েছে। সব মিলে অধ্যাপক চ্যবনের Explosive কথাটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে একটি অন্য প্রসঙ্গের সংযোজনও আবশ্যক বলে মনে করি।

আলেকজাণ্ডার মনে করতেন যে মানুষ কোন একটি দেশের অধিবাসী নয়। সে সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসী। Cosmopolis-এর বাসিন্দা। বিশ্বভ্রাতৃত্বের একটি চিন্তা প্রাচীন যুগে খুব অস্পষ্টভাবে শুরু হলেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নানা মনীষীর মধ্যে তা এক প্রতিষ্ঠিত সত্যরূপ লাভ করেছিলো। অধ্যাপক Chavan এর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত উক্তির সঙ্গে এই আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণাটি দেখে নেয়া প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ কি রকম কতটা ছিল সে ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু স্বদেশচিন্তার ইতিহাসের আলোচনায় রোঁলা, রাসেল ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের সীমানা ডিঙানো বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় স্বাদেশিকতার বা স্বদেশচিন্তার ইতিহাস নয় তবুও একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে স্বাদেশিকতার প্রান্তে যে সামান্য সংকীর্ণতার ক্লেদ প্রায়শই জমে তা আন্তর্জাতিকতার বিশ্বমানববোধের আকাশেই সত্যিকারের গণ্ডিমুক্ত কল্যাণের পথ পেতে পারে। রাজতন্ত্র যেমন একটি বন্ধন, জাতীয়তাবাদও অনেক উন্নত-স্তরের হলেও মানবজাতির কাছে একটি বন্ধনই। দেশের সীমাও একটি সীমাই। সেই বন্ধনমুক্তির-উপায় আছে আন্তর্জাতিকতাবাদে। উনবিংশ

শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের চিন্তাগত প্রসারও পৃথিবীতে খুব কম হয়নি। সেজন্য স্বাদেশিকতাকে এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠতম ধারণা হিসেবে নির্দ্বিধায় না মেনে নেওয়াই ভালো। বরং মনে করা যাক স্বাদেশিকতায় যার সূচনা হল, অন্ততর কোনো বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধে তার পরিস্ফুটন ঘটবে আগামী কোনো এক সময়ে।

প্রথম অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।' তবে এই শ্লোকের স্বদেশ কথারঅর্থ আজকে আমরা 'স্বদেশ' বলতে যা বুঝি তা,নাকি স্বীয় অধিকারভুক্ত দেশ।

২. দ্র- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৩০২

৩. ঐ পৃ-১১৩২

৪. শিবাজী, রণজিৎ সিংহ ও বাবরের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় আধুনিক ভারতীয় স্বদেশ-চিন্তার পূর্বসূচনা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিবাজীর। ১৬৭৯ সালে 'জেজেয়া-কর' ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রবর্তনের বিরুদ্ধে শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে যে চিঠি লেখেন তার যুক্তি বিন্যাস আজকের গণতান্ত্রিক যুগের জননেতাদের মত। শিবাজী লিখেছেন—
'But in your Majesty's reign, many of the forts and provinces have gone out of your possession, and the rest will soon do so too, because there will be no slackness on my part in ruining and devastating them. Your peasants are downtrodden; the yield of every village has declined,—in the place of one lakh (of Rupees) only one thousand, and in the place of a thousand only ten are collected, and that too with difficulty. When Poverty and Beggery have made their homes in the palaces of the Emperor and the Princes, the condition of the grandees and officers can be easily imagined. It is a reign in which the army is in a ferment, the merchants complain, the Muslim cry, the Hindus are grilled, most men lack bread at night and in the day inflame their own cheeks by slapping them......May it please your Majesty! If you believe in the true Divine Book and word of God (i. e. the Quran) you will find their (that God is styled) Rabbulotamin, the Lord of all men, and not Rabbul-musalmin, the Lord of the mahammadans only.'
From Shivaji and his times. By Jadunath Sarkar, Orient Longman, 1973. P-322-323.

৫. দ্র- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৮২৮

৬. দ্র- The New Encyclopaedia Britanica, Vol. 17, 1979, P-609.

৭. Page-7, Published by Orient Longman Ltd. 1973.

৮. বাঙালীর ইতিহাস—সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম খণ্ড, পৃ-৫৫৭

৯. "Nationalism is a state of mind in which the Supreme loyalty of the individual is felt to be due the nation state"—Nationalism it- Meaning and History by Hans Kohn, P-9.

১০. Nationalism in Asia-R. S. Chavan. P-4

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমপূর্ব বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির জীবনে স্বদেশচিন্তার উন্মেষ

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে (১৭৭৪) রামমোহন রায়ের জন্ম হয়।[১] মুঘলসাম্রাজ্য ও শাসনতন্ত্র তখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত দেশ বিভ্রান্ত। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে ইংরেজ রাজত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠছিল। কিন্তু তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে মরাঠা শক্তির পতনের পর। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ঘোষণা করলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করেছে।

আজ আমরা জানি রামমোহনই প্রথম একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাঙলার মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীকার, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, কুসংস্কারমুক্তি, সামাজিক বৈষম্যমোচন, জাতিগত বিভেদ বিলোপন, শিক্ষার প্রসারণ, নারীজাগরণ—এ সমস্তই সম্ভব হতে পারে একমাত্র পাশ্চাত্যশিক্ষার সংস্পর্শে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীর মধ্যে এ প্রক্রিয়ায় সমস্যা-লাঘবের প্রচেষ্টা ছিল না। ইংরেজ অধিকারের পরেও বহুবছর নবাগত এই পাশ্চাত্য ভাবধারার বিরুদ্ধে একটি অসচেতন ও কূপমণ্ডুক-বিরুদ্ধতা বিরাজমান ছিল। রামমোহনই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমের ভাবনাকে মিশিয়ে পথ-নির্ধারণ করতে হবে। সে কারণেই রামমোহন আধুনিক ভারতের প্রথম পথিক। তিনি নতুন পথ কেটেছিলেন। হয়তো স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও তাই। এ বিষয়ে রামমোহনের জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করে একটি নিপুণ পরিকল্পনার পরিচয়ও মিলবে। নিজের দেশকে জানার জন্যে, দেশের বহুবিচিত্র প্রকৃতি, মানুষ, জীবনচর্যা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে এদেশে আমরা দেখেছি যে চিন্তানায়ক ও জননায়কেরা প্রায় প্রত্যেকেই দেশ পর্যটন করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী,

স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই দেশ পর্যটনের নেশা তাঁরও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যার্জন, ধর্মজিজ্ঞাসা, চাকরী, ব্যবসা প্রভৃতি উপলক্ষ তরুণ বয়স থেকে তাঁকে বারবার ঘরছাড়া করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে যোশিদা তোরাজিরোর কথা উল্লেখ করেছেন। তোরাজিরো বিখ্যাত জাপানী 'প্যাট্রিয়ট'। দেশকে বোঝার জন্যে 'চালচিড়া বেঁধে' তিনি সমস্ত জাপান ঘুরে দেখেছিলেন। পরে দেশের কাজে তাঁকে প্রাণও দিতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তোরাজিরোর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।'

রামমোহন রায়ও তাঁর শেষজীবনে লিখিত আত্মজীবনীমূলক পত্রে নিজের প্রথম বয়সের পর্যটক জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন : "...I proceeded on my travels and passed through different countries chiefly within, but some beyond the bounds of Hindoostan".

দেশপর্যটনের কোনও ধারাবাহিক বিবরণ রামমোহন রেখে যাননি। তোরাজিরো বা স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁর দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিত প্রমাণও নেই। কিন্তু অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছেন তা থেকে হয়তো এর পেছনে কি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তা কিছুটা বুঝতে পারা যাবে। য়ুরোপ যাত্রার আগে তাঁর ঐ পত্রে তিনি লিখেছেন—

"I now felt a strong wish to visit Europe and obtain by personal observation a more thorough insight into its manners, customs, religion and political institutions".

এই পত্রের শেষ পংক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। য়ুরোপ ভ্রমণে তিনটি বিষয়কে লক্ষ্য করার জন্য রামমোহন বেছে নিয়েছেন : Customs, religion ও Political Institution। রামমোহন রায়ের চিন্তাজগতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখে বেরিয়ে আসে। এ-ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে রামমোহনের মধ্যে এই তিনটি বিষয় সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল : এবং এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে 'customs' বা লোকজীবনের আচার-ব্যবহার হয়তো তেমন প্রাধান্য পায়নি কিন্তু 'ধর্ম' বা 'রাজনৈতিক ভাবনা' কোনটি

রামমোহনকে তাঁর চিন্তাজগতের চূড়ায় নিয়ে গেছে বা এই দুটি যুগ্মভাবেই রামমোহনের মানসক্রিয়ার পেছনে ছিল কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা করা এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব হলেও এই অমীমাংসিত সমস্যাটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতবহও বটে। স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি বিষয়কে অগ্রাহ্য করে একটা পুরোপুরি রামমোহন পাওয়া যাবে না। রামমোহন রায়ের জীবন ও রচনাবলী বিশ্লেষণ করার পর এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বঙ্কিম-পূর্ব বঙ্গদেশে স্বদেশচিন্তার ইতিবৃত্তকে বুঝতে হলে রামমোহনকে বর্জন করা যায় না।

তবে একটি অন্যমতও এ প্রসঙ্গে আছে। রামমোহন রায় সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন যে তিনি ইংরেজি শিক্ষার একটি product, অর্থাৎ ইউরোপের কাব্য-ইতিহাস-দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবেই তাঁর মন তৈরী হয়েছিল।[২] রামমোহনের প্রসঙ্গ এ বিষয়ে অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে একটা চলতি মত হচ্ছে—স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম, আধুনিক রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এ-সব বিষয় আমরা ইংরেজদের থেকে নকল করে শিখেছি। অর্থাৎ ইংরেজরা যেহেতু দেশপ্রেমিক ও স্বদেশবৎসল এ-সব দেখেশুনে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মানুষরাও ক্রমে-ক্রমে অনুকরণ করে দেশপ্রেমিক হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ডিরোজিওর বিখ্যাত কবিতার[৩] কথা বলা হয়, ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের সাক্ষ্য টানা হয় এবং এই সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারদের সংখ্যাধিক্যের কথাও বলা হয়। স্বাদেশিকতা আমরা কোথায় পেয়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেই তার স্বাভাবিক দেশীয় বিকাশ হয়েছে কিনা এ বিচার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা সূত্রে বিশদভাবে আমরা করেছি। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনাতেও এই প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রামমোহনই প্রথম এদেশে স্বাদেশিকতার মুক্ত জনপথে পদক্ষেপণ করেছিলেন। সুতরাং রামমোহন ইংরেজের নকল করেছেন, নাকি তাঁর মানসক্রিয়ায় দেশজভাবেই স্বাদেশিকতার বিকাশ ঘটেছিল এ প্রশ্নটির বিচার আমরা প্রথমে করে নেবো।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে এ সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'Bengal produced in the last Century a man of colossal intellect and marvellous clairvoyance Rajah Ram Mohan Roy....British India upto now has not produced a

greater mind, and he remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age and the genius of our ancient land. He looked at European civilisation from the pinnacle of Indian culture and saw and welcomed all that was living and life giving in it'.*

এই অভিমতটির আরও ব্যাখ্যা করে রামমোহন সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জীবনে ও মননে যে আমূল পরিবর্তন ঘটবে, ভারত সভ্যতা যে নবকলেবর ধারণ করবে, এ সত্য সর্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায়েরই চোখে পড়ে। 'সে যুগে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর অন্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ সাকার হয়ে উঠেছিল।' লিবার্টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধি থেকেই স্বজাতিকে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, তিনি ব্যক্তিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানতেন দীর্ঘদিনের পরাধীনতাজনিত গ্লানিতে আমাদের দেশের মানুষ দুর্বল, ভয়ার্ত ও দীন। সেইজন্য এই জাতির দুর্বলতা ভয় ও দৈন্য কি ভাবে দূর করা যায় এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভাবনা। এই কারণেই—'জাতীয় মনকে অবিদ্যার মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রামমোহন রায় এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আবাহন করে নিয়েছিলেন।' প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যের সঙ্গে আমরা মোটামুটি একমত। কেন একমত তা বোঝা যাবে রামমোহনের জীবনের নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহ থেকেও।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সে যুগের (১৮২৩) বিধিনিষেধ এবং তার প্রতিবাদে রামমোহনের ভূমিকা। অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল জন অ্যাডাম ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ ভারতবর্ষে সে যুগের সদ্যোজাত সংবাদপত্রসমূহের উপরে এক কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ১৭ই মার্চ রামমোহন প্রথম কলকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে মিলিতভাবে এক স্মারকলিপি পাঠালেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে। এই স্মারকলিপি রামমোহনেরই লেখা। এই স্মারকলিপি রচনার আগে রামমোহন তাঁর ফার্সী

কাগজ 'মীরাত-উল-আখ্‌বার' বন্ধ করে দেন ঐ নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে। তারপর সেই চিঠিতে লেখেন—

'Your Memorialists are persuaded that the British Government is not disposed to adopt the political maxim so often acted upon by Asiatic Princes, that the more a people are kept in darkness, their rulers will derive the greater advantages from them ; since by reference to History, it is found that there was but a short-sighted policy which did not ultimately answer the purpose of its authors. On the contrary, it rather proved disadvantageous to them, for we find that as often as an ignorant people, when an opportunity offered, have revolted against their rulers all sorts of barbarous excesses and cruelties have been the consequence".*

ভাষা থেকেই বোঝা যায় এ শুধু নিয়ন্ত্রণাদেশ তুলে দেবার আবেদন নয়, এ এক ধরনের সতর্কীকরণও। এ লেখার পেছনে প্রচ্ছন্ন ধমকের সুরও আছে। এই পত্রের সুরে সুবিচার প্রার্থীর করুণ আবেদন নেই বরং যেন একজন সভ্যতা ও সুনীতির শিক্ষক এখানে পথনির্দেশ করছেন। অনুমান করি এই স্বাধিকার-সচেতনতা ইংরেজের অনুকরণ থেকে আসেনি। এরমধ্যে নির্ভীক ভারতীয় প্রজ্ঞার তেজ মেশানো আছে। সে সঙ্গে আছে নির্ভীক স্বদেশবাৎসল্য এবং সত্যদৃষ্টিও।

বলাবাহুল্য, সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদনে কাজ হোল না। তখন রামমোহন নিজে পত্র লিখলেন—'The King in the Council'কে। লিখলেন—'..a free press has never yet caused a revolution in any part of the World, because, while man can easily represent the grievances arising from the conduct of the local authorities to the supreme Government, and thus get them redress, the grounds of discontent that excite revolution are removed , whereas where no freedom of the press existed, the grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumberable revolutions have taken place in all parts of the globe.

ঐ পত্রেই আরও লিখলেন—'against the injustice of robbing them of their long standing privileges, by the introduction of numerous arbitrary restrictions totally uncalled for by the

circumstances of the country—and whatever may be their intention, calculated to suppress truth, probet abuses—and encourage oppression'.[৮]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীকাররক্ষার্থে এই যুক্তিসমূহ আজও ব্যবহারযোগ্য। বস্তুত রামমোহন এই দেশে যে সময়ে যে শক্তিমান শাসকগোষ্ঠীর দিকে তর্জনী তুলে এই কথা বলেছেন তাঁরা সে মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি। তাঁদের রামমোহন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নিয়ন্ত্রণ ও পেষণের উল্টোদিকে যে প্রতিবাদ ও বিপ্লব থাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই চিঠির পূর্বসূচনা আছে রামমোহনের ফার্সী কাগজে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায়। যেখানে তিনি 'আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্দশা ও অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধ লেখেন। এই চিঠির সাত বছর পরে পৃথিবীতে ফরাসীর জুলাই বিপ্লবের যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটলো। রামমোহন সেই যুগে বসে সমস্ত পৃথিবীর স্বদেশচেতনার উন্মেষ, প্রতিটি জাগরণের স্পন্দন ঠিক অনুভব করতে পারছিলেন। যদিও স্বাদেশিকতা ও গণতন্ত্রের ধারণা সমস্ত বিশ্ব জুড়েই তখন অস্ফুট, তবুও সেই অবস্থাতেও পৃথিবীর সব থেকে শক্তিমান রাজাকে সেই অনাগত প্রবল শক্তির ভয় তিনি দেখিয়েছিলেন। সে সঙ্গে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী জুলাই বিপ্লবকে রামমোহন দেখেছিলেন দশম শার্লের 'The Four Ordinances of st cloud' এর বিরুদ্ধে জনগণের মহান উত্থানরূপে। তাই ইংলণ্ডের পথে খোঁড়া পা নিয়ে ফরাসী জাহাজের মাথাতে বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'Glory, glory, glory to France'[৭] ইংলণ্ডে ১৮৩১-এর রিফর্ম বিল নিয়ে পার্লামেন্টের বিতর্ককে তিনি বর্ণনা করেন—'Struggle between liberty and tyranny throughout the world, between justice and injustice, between right and wrong'.[৮]

ঐ রিফর্মবিল গৃহীত না হলে ইংলণ্ডের প্রতি তিনি সব শ্রদ্ধা হারাবেন ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন একথাও রামমোহন ঘোষণা করেন।[৯] ইংলণ্ডের জনগণও যে সে দেশের ন্যস্ত কায়েমী স্বার্থের অধীন এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে লেখেন,—'The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purpose at the expense, may to the ruin of the people'.

১৮২৩ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলো বিভিন্ন অত্যাচার থেকে যখন মুক্ত হল, সেই সংবাদে রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, শুধু তাই নয় নিজের বাড়ীতে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে ঔপনিবেশিক জনগণকে অভিনন্দিত করেছিলেন তিনি। এই সভায় তাঁর বহু ইয়োরোপীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করেন, দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতালাভে তাঁর এত আনন্দ কেন? তাঁদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ রামমোহনের সম্পর্কই বা কি? উত্তরে উত্তেজিত ভাষায় রামমোহন বলেছিলেন: 'What! ought I to be insensible to my fellow creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language?'

আজকের পৃথিবীতেও এ কথা বলার মতো মানুষ খুব বেশি নেই। ভাষাদ্বেষ, ধর্মবিরোধ, ক্ষুদ্রস্বার্থের হিংসা, দ্বন্দ্ব, এখনো পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই ঘটছে। কিন্তু সেই অন্ধকার ভারতবর্ষে নিজেই যিনি নিজের দেশের মানুষদের হাতে প্রায়শই চূড়ান্তরকম লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাঁর এই কথা আজও আমাদের কাছে প্রায় দৈববাণী বলে মনে হয়। এ-ই হচ্ছেন রামমোহন। এ সমস্ত মন্তব্য, ঘোষণা ও আচরণ তাঁর স্বকীয় চিন্তালব্ধ স্বাধীনতাপ্রিয়তার উচ্চ মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। রামমোহন আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম স্বাধীন পথিক। আমাদের দেশের পরবর্তী সমস্ত মনীষীদের রামমোহনের গৃহ থেকে স্বদেশ-চিন্তার অগ্নিকণা সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তও স্বদেশ নিয়ে ভেবেছেন, কিন্তু তাঁর চিন্তায় রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের শৃঙ্খলা নেই। তিনি 'শিখযুদ্ধ', 'কাবুল যুদ্ধ' ও 'ব্রহ্মযুদ্ধে' ইংরেজের জয়গান করেছেন। ভারতীয় হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছেন—'ভারতের প্রিয় পুত্র-হিন্দু সমুদয়, মুক্ত মুখে বল সবে বৃটিশের জয়।' সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক নানাসাহেব ও ঝাঁসীর রাণীকেও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সিপাহী যুদ্ধের বিষয়টি সে যুগের অনেক মনীষীর মতো তিনি হয়তো বুঝতে ভুল করেছেন কিন্তু ঝাঁসির রাণী সম্পর্কে ও শিখ যুদ্ধের বিষয়ে ভুল হওয়া আজকাল প্রায় অমার্জনীয় বলে মনে হয়। এই ঈশ্বর গুপ্তই যখন 'স্বদেশ' কবিতায় লেখেন ইন্দ্রের

অমরাবতীর স্বর্গসুখ ভোগ করতে ইচ্ছে হয় না বরং শিবধামের মতো পবিত্র যে স্বদেশ তাতেই বাস করতে ইচ্ছে হয় তখন মনে হয় যেন আমরা দু'জন ঈশ্বরগুপ্তের সম্মুখীন হচ্ছি। বস্তুত 'ভারত সন্তানগণের প্রতি' কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত বলছেন—

পরপর দিন যত ক্রমে হয় গত
ভ্রান্তি রূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত॥
উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার॥
এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত॥

এই দ্বিমুখী এবং প্রায় বিপরীত ভাবপ্রকাশের ফলে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে আমরা যে সংশয়ের সম্মুখীন হই তার একধরণের গ্রন্থিমোচন ঘটতে পারে সে যুগের সাধারণজনের মানসিকতার বিশ্লেষণ থেকেও। ইংরেজশাসন সম্পর্কে একই সঙ্গে বিপরীত দুটি মতপোষণ সে যুগেরই এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের আগমনে দেশে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটছে, দেশে বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে—এরকম অভিমত তখন চালু ছিল। সেই সঙ্গে ইংরেজ বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষে অন্যায় রকমের লুণ্ঠন করছে তাও তখন কেউ-কেউ মনে করতেন। এই বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী মতদ্বয়ের বিভ্রমে ঈশ্বরগুপ্তও আক্রান্ত ছিলেন।[১০] শুধু ঈশ্বরগুপ্ত কেন প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'বঙ্কিম সরণী' গ্রন্থে বলেছেন 'হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র সকলের রচনাতেই এই দ্বিত্বভাবনা বর্তমান'[১১] তবে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে মনে করতে হবে যে, এই দ্বিধা সত্বেও ভারতভূমিকে জননী-রূপে সম্বোধন করার কাজটি তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম করেছেন।[১২] এর কাছাকাছি সময়েই ডিরোজিও তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন—'টু ইণ্ডিয়া মাই নেটিভ ল্যাণ্ড'। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী অনুমান করেছিলেন এটি আমাদের দেশের প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা।[১৩] ডিরোজিওর কবিতা প্রথম হলেও বঙ্গদেশের কাব্যে দেশাত্মবোধের আবেগ ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম রচনা করেন। তাঁর 'স্বদেশ,' 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব,' 'ভারতভূমির দুর্দশা,' প্রভৃতি কবিতায় আমরা সেই আবেগে প্রথম আপ্লুত হই। রামমোহনের প্রবন্ধের ও চিঠির দেশাত্মবোধ মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন্

কোন্ মানুষকে আলোড়িত করেছিল আমরা জানিনা, যদি আলোড়ন হয়ে থাকে তবে তা হয়েছিল সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে, যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। অন্যদিকে ডিরোজিও জনচিত্তে প্রথম দেশাত্মবোধকে আবেগে রূপান্তরিত করে পৌঁছুলেন হিন্দু কলেজের নির্বাচিত ছাত্রমণ্ডলীর কাছে। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত সে বোধকে নিয়ে গেলেন আরও বিস্তৃতক্ষেত্রে; সাধারণ্যে। সমস্ত দ্বিধা, স্ববিরোধিতা ও পদে পদে সংশয় সত্বেও এখানেই ঈশ্বরগুপ্তের স্বাদেশিকতার মূল্য। তিনিই প্রথম দেশপ্রেমমূলক আবেগের বিস্তার ঘটালেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য পরে গুরুকে এই ক্ষেত্রেও অতিক্রম করে গেছিলেন। তবে সে আলোচনার স্থান এটা নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫)

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

> 'স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষায় চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'

১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। শৈশবে তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দু স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন।[১৪] ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ভাষা ও ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করা। ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এই সভায় বাংলা ভাষায় আলোচনা হ'ত। এই সভার প্রধান কীর্তি, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশনা (১৬ই অগাষ্ট ১৮৪৩)। বিদেশী রাজত্বে দেশের অসহায় কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা ও নীলকর সাহেবদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সহজবোধ্য ও সরল ভাষায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করতেন।[১৫]

এই সময়ে জাতিকে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—এ কথা বলা চলে। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাড়াও আরও বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে হেয়ার মেমোরিয়াল কমিটি, হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড, বীটন সোসাইটি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। নারীদের শিক্ষা, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য-বিবাহবর্জন, এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে আন্দোলন করা 'সুহৃদ সমিতি'র প্রধান কর্তব্যরূপে গণ্য হত।[১৩] দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ না করলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রেরণা অবশ্যই পেয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীর এক জায়গায় লিখেছেন—

'যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারত-বর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।'[১৪] বৈদান্তিক ধর্মের ভিত্তিতে মিলিত হলে ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব, এ বিশ্বাস তিনি এই সময়ে পোষণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দুবছরেরও বেশী সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনেরও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিশেষ চেষ্টায় এই সভার ভিত্তি দৃঢ় হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলায় 'ভারতবর্ষীয় সভা' নামে পরিচিত ছিল।

ইংরেজরা এ সময় এদেশের মানুষদের উপর ছোটখাট প্রশাসনিক ব্যয়ভার চাপানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চৌকিদার মাসোহারা ও লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় আইনের প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথ এ সময় স্বদেশবাসীকে সচেতন করে তুলছিলেন। ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথকে লেখা রাধাকান্ত দেবের এই চিঠিতে তার প্রমাণ আছে—

'If our 'Lakheraj' Petition fails to gain its end here we should appeal to the proper authorities in England......we cannot but expect the most complete success on the strength of the precedent in the case of the Raja of Burdwan.' (The

Calcutta Municipal Gazette, 11 July, 1942, Vol. XXXVI. P. 236)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেশ থেকে ইংলণ্ডে কিভাবে সম্পদ প্রেরিত হচ্ছিল তার একাধিক বৃত্তান্ত তখন ছাপানো হয়েছে। এসব সূত্রেই এদেশের মানুষের থেকে সংগ্রহিত অর্থ যেন এদেশের মঙ্গলার্থেই খরচ হয়, সেই কথা দেবেন্দ্রনাথের মনে হতে থাকে। চৌকিদার নিয়োগের খরচের প্রসঙ্গটি উপরের চিন্তারই ফলশ্রুতি। এ বিষয়ে পার্লামেন্টকেও তিনি লিখলেন—'The rural population, whose industry most largely contributes to the resources of the state, were left not only without adequate protection, but without many of the advantages which are enjoyed by other classes. The means devised in the draft of an Act for affording protection to them, contemplated a control over the watchman employed by the villages at their own expense, but involved no outlay from the public resources. But as it happened that a considerable portion of the revenue was raised with a vowed object of providing a sufficient police force for the country, the committee were bound to bring to the notice of the Government the wrong which would be done ; were the proposed measure to be carried into effect, and the obligation which had long been incurred but not fulfilled, of providing a sufficient force for the protection of the people." ('Studies in the Bengal Renaissance', Ed. by Atul Chandra Gupta. Dec., 1958, Jadavpur, P-207).

এই চিঠির ভাষা রামমোহনের থেকে সংযত তবুও এ চিঠি থেকেও রামমোহনের উত্তরসূরিকে চেনা যায়। বোঝা যায় যে এ মানুষটি বিশেষভাবে চিন্তিত গ্রামের মানুষদের নিয়ে। সে সঙ্গে রামমোহনের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ও পাই যখন আমরা দেখি যে চৌকিদার নিয়োগে অর্থবরাদ্দের সুপারিশ তিনি করছেন কিন্তু পুলিশ নিয়োগের নয়। কারণ দেবেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন চৌকিদার হবে গ্রামরক্ষক অন্যদিকে পুলিশ হবে সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার। তবে দেবেন্দ্রনাথের পত্র যুক্তির উপস্থাপনাতেই শেষ হয়েছে। রামমোহন এ চিঠি লিখলে তাতে দু-একটি সতর্কবাণীও হয়তো পাওয়া যেত।

এ ছাড়াও এ সময় বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে আলাদা নিয়ম ছিল[১৮]। ভারতীয়দের বিচারক হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হচ্ছিল ইংরেজদের হচ্ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ এই একদেশদর্শী নীতিরও বিরুদ্ধতা করেছেন।

তবে প্রশ্ন জাগে জীবনের উত্তরভাগে যখন ধর্মীয় কাজে তিনি প্রথমে আত্মনিয়োগ ও পরে আত্মগোপন পর্যন্ত করলেন তখন কি স্বদেশের হিতের কোনো মূল্য তাঁর কাছে ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছুটা পাই রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—'আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ় ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।'

হয়তো দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উত্তরাধিকার আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখেছি। তবে তা ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও ছিল। চৌকিদারি আইন সহ নানা সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে তিনি ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সংঘাতের পথ বর্জন করে তিনি ধর্মীয়চেতনার প্রসার ও সমাজসংগঠনের কাজ হাতে তুলে নেন। অর্থাৎ প্রতিবাদমূলক স্বদেশ-চিন্তা থেকে গঠনমূলক চিন্তায় তিনি সরে এসেছিলেন। প্রতিরোধের বদলে সৃজনকে নিজের কাজ করে নিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের কাজ যে শুধুমাত্র ইংরেজ বিরুদ্ধতাই নয় এর যে অন্যরকমের প্রসারও ঘটতে পারে সে যুগে যাঁরা একথা ভালো করে বুঝেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

বিদ্যাসাগর একবার বলেছিলেন, যে দেশে মানুষের এতো প্রবলরকমের দুঃখ, এতো সীমাহীন দুর্দশা, সে দেশে আবার রাজনীতি কেন?

উক্তিটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের স্বদেশচিন্তা সম্পর্কে একটা মোটামুটি হদিশ এ উক্তি থেকে মেলে। অন্যদিকে স্বদেশানুরাগ বলতে বিদ্যাসাগর কি বুঝতেন এ উক্তিতে তারও একটা আবছা চেহারা পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের যুগে বিভিন্ন মনীষী দেশহিত সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের চিন্তা করেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি তখনো বেশি উচ্চারিত হতোনা। তবে কংগ্রেসের সূচনা (১৮৮৫) ইতোমধ্যে হয়েছে।[১৯] ইংরেজদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির জয়গান দু-একজন জননেতা এ দেশেও করতে শুরু করেছেন। তবে আমাদের দেশে ডেমোক্রেসির পত্তন হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা তখনো জনচিত্তে পরিষ্কার হয়নি। স্বদেশানুরাগ তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড়লোকি ব্যসন। ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো স্বদেশানুরাগীদের নানা বাৎসরিক উৎসব, মেলা, শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাস করে এসবকে বলেছিলেন 'ব্যানঘ্যানানি'। সেসবে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনীতিও এসেছে। তবে বিদ্যাসাগর এ সবের বাইরে এক অন্যজাতের কর্মী। তিনি নিজের মতো করে কিছু কাজ বেছে নিয়েছেন। সর্বদা সেই কাজে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। যখন কথা বলেন তখনো বাবুদের সঙ্গে তাঁর কাজের বিভেদ পরিষ্কার বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর বলেন—'বাবুরা কংগ্রেস করছেন, অন্দোলন করছেন, বক্তৃতা করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার লোক অনাহারে প্রতিদিন মরছে সেদিকে কারও চোখ নেই, রাজনীতি নিয়ে কী হবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খেয়ে প্রত্যহ মরে যাচ্ছে, সে দেশে আবার রাজনীতি কি?'[২০]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রেম হচ্ছে দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের সেবা। পরহিতব্রত। যেখানেই দুঃখকষ্ট, সেখানেই বিদ্যাসাগর। দেশবাসীর দুঃখমোচনই তাঁর স্বদেশানুরাগ। রামমোহন যে মানবমুক্তির কথা বলেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে তার এক অন্যরকমের বিস্তার আমরা দেখি। রামমোহনের মানবমুক্তি কর্মী বিদ্যাসাগরের কাছে দুঃখত্রাণকর্ম ও দারিদ্র্যমুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষ সব মানুষকে ভালোবাসার যে অসংখ্য উদাহরণ আমরা তাঁর জীবনচরিতে পাই, তা থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের দুঃখ তাঁর ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি হৃদয়বিচলনকারী শক্তি। ব্যক্তিগত মানবতা-বোধ থেকেই বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে। সাধারণ সমাজহিতৈষীরা বা রাজনৈতিক মানুষেরা কোনো দুরূহ বিশ্লেষণ বা জটিল মননক্রিয়ার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন, বিদ্যাসাগর একটি মানুষের দুঃখ দেখে, একটি বিধবার করুণ কাহিনী থেকেই, সেই নির্ভুল লক্ষ্যে যেতে পারতেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মনের ও অনুভবক্ষেত্রের এই নৈকট্যই হচ্ছে

বিদ্যাসাগরের কর্ম ও চিন্তাশক্তির অন্যতম উৎসস্থল। এ জন্যেই দেশের কল্যাণমূলক প্রায় সমস্ত কাজে সে যুগে বিদ্যাসাগরের মনীষার সংযোগ ঘটতে পেরেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই লিখেছিলেন যে,— '…তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন।'[২১] এই উক্তির 'দেশ' শব্দটির বদলে 'মানুষ' শব্দটি বসিয়ে নিলে মনে হয়—উক্তিটি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আরও বেশি সুপ্রযুক্ত হবে।

সামাজিক সমস্যা যে সোজাসুজি বিদ্যাসাগরের সম্মুখীন হতো না তাও সবসময় ঠিক নয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা, প্রধানতঃ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রয়াস এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ দেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠুক এজন্যে তাঁর প্রচেষ্টার কোনও শেষ ছিল না। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নানা তথ্যপূর্ণ খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন ইন্দ্রমিত্র মহাশয় তাঁর 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে। মূলত মেয়েদের জন্য বিধবাবিবাহের প্রচলন, বহুবিবাহ রদ ইত্যাদি যে উদ্যোগ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিয়েছিলেন, মেয়েদের শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াসটি তার পরিপূরক। এ সব উদ্যোগের মাধ্যমেই তাঁর ব্যক্তিগত পরহিতব্রত সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করলো।

এ রকম সামাজিক প্রচেষ্টা দেখা যাবে তাঁর সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তেও। বিদ্যাক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার বিলোপন বাংলায় বিদ্যাসাগরের হাতেই ঘটলো। বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্তির আগে সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শ্রেণীর ছাত্রদের অধ্যয়নের অধিকার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে 'ইহার দ্বার কায়স্থ জাতির নিকট উন্মোচন করিয়া দিলেন। ১৮৫৪ সনে তিনি এখানে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মাত্রেরই প্রবেশাধিকার দিলেন। সংস্কৃত অধ্যয়ন অনুশীলনে টোল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ বৈদ্যেতর জাতির অধ্যয়নের অধিকার ছিল না; ১৮৫৪ সনে সংস্কৃত কলেজে এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট স্বজাতীয় সাহিত্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন অনুশীলনের পথ সুগম হইল। মানুষের এই মৌলিক অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের একটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশীয় প্রাচীন বিদ্যার পুনঃ প্রচলন ব্যাপক আকারে সম্ভব হওয়ায় রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি বস্তুগত ও সত্যোপেত হইয়া উঠিল। ইহার সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সংস্কৃত

কলেজের উক্তরূপ মৌলিক অধিকারের মধ্যেই আমরা সবিশেষ লক্ষ্য করি।'[২২]

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নবজাগরণের ধারার অনুকৃতি আমরা অবশ্য এই কাজে বিশেষ পাই না বরং বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রকারের ভেদবোধহীন মানবিক দৃষ্টি এ প্রসঙ্গে আমরা বেশি দেখতে পাই। সে যুগে সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রধান রক্ষক ছিল সংস্কৃতকলেজ। বিদ্যাসাগর সেই প্রতিষ্ঠানেরই গতি আধুনিকতার দিকে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তবে এ জন্যে তাঁকে কম ব্যক্তিগত পীড়া সইতে হয় নি। তাঁর জীবনীকারেরা প্রায় সবাই সবিস্তারে সে-সব বর্ণনা করেছেন।

সামাজিক শিক্ষার কাজ, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্যে তাঁর ভয়ানক শারীরিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছিল। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করা এবং নানারকম উন্নতিকল্পে মিস মেরী কার্পেন্টার কলকাতায় আসেন ১৮৬৬ সালে। ছোটলাটের অনুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রও মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে স্কুল পরিদর্শনের জন্যে নিযুক্ত হন। একদিন ফেরার পথে বিদ্যাসাগরের বগি উল্টে যায় এবং তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। এর ফলে যকৃতে তিনি যে আঘাত পান আমৃত্যু তার যাতনা থেকে তিনি রেহাই পান নি। সুতরাং দেখা যায় নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারে তিনি শুধু 'আর্থিক ক্ষতিই স্বীকার করেন নাই, নিজের জীবন পর্যন্ত এইরূপে বিপন্ন করিয়াছিলেন।'[২৩]

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্যাসাগরের স্বদেশপ্রেম কি শুধু এই বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল? জিজ্ঞাসা জাগে রামমোহনের পরবর্তী হয়েও তাঁর স্বদেশবোধ রামমোহনের মতো আন্তর্জাতিক মানের ছিল না কেন? সর্বোপরি জানতে ইচ্ছে হয় তিনি কি সত্যি একজন স্বদেশপ্রেমিক নাকি এক উৎকৃষ্ট সংস্কারক এবং লোকহিত-কর্মে জীবনপণ করা এক দয়ালু ব্যক্তি মাত্র? এ সব জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যায় এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবোধ বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে আমরা বারবার দেখি। এই বোধ পৃথিবীতে আজও উৎকৃষ্টতম। অন্যদিকে শুধু মাত্র দুঃখী মানুষ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দুঃখমোচন ও মিশনারীব্রতের মধ্যেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর এ-সব কাজের পেছনে আবেগ ও অশ্রুজলের সঙ্গে এক অসামান্য পরিকল্পনাও অনুস্যূত ছিল। দেশের

মানুষের মূঢ় ও ম্লান মুখে আশা ও ভাষা দেবার কথা রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অনেকবার বলেছেন। বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'সাম্য' ও 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' প্রবন্ধে। বস্তুত দুর্বল ও অশিক্ষিতদের সঙ্গে সম্পন্ন ও শিক্ষিতদের যে বিচ্ছিন্নতা তা বিদূরিত না হলে দেশের কল্যাণ নেই, এই কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের সর্বজনস্বীকৃত অভিমত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশি বাক্যব্যয় না করে প্রথমেই সেই কাজে হাত দিয়েছিলেন। এবং শিক্ষা সংগঠন, সমাজ-সংস্কার এমন কি ব্যক্তিগত দান এ সব দিক থেকেই তিনি এই চেষ্টা শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ স্বদেশসেবার বুলিকে তিনিই এদেশে প্রথম কাজে পরিণত করেন। অন্যেরা প্রবন্ধে যে কথা লেখেন বিদ্যাসাগর কাজেই তা করেন। এ কারণেই যে চিন্তা আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক সমূহে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার কর্মে পাই তারই উৎস সম্ভবত আছে বিদ্যাসাগরে। রামমোহনের স্বাদেশিকতার ব্যাপ্তি অবশ্যই বিপুল। সে চিন্তা বিশ্বের ইতিহাসের মূল পরিবর্তনকে অনুভব করে, শক্তিতে তাকে নাড়িয়ে দিতে চায়। বিদ্যাসাগরের স্বাদেশিকতা দেশের শিকড়ে মনোনিবেশ করে থাকে। তার গতি দেশমৃত্তিকার সুগভীর স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। এ দিক থেকে দুজন যেন দুজনের পরিপূরক। বঙ্গদেশের স্বদেশচিন্তার মননক্রিয়া এ দুজনের যুগ্ম উদ্যোগে একটি বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ মূর্তি সেই যুগেই লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে এই দুজনের প্রত্যক্ষপ্রভাব বিশেষ অনুভব করা যায় না। কিন্তু এই দুই জাতের স্বদেশচিন্তার যে কি বিপুল প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পড়েছিল সে কথা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধসমূহের আলোচনার সময় বারবার দেখতে পাবো।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬)

বঙ্গদেশে রাজনৈতিকচিন্তার ক্ষেত্রে এক অর্থে রামমোহনের উত্তরপুরুষরূপেই আমরা অক্ষয়কুমার দত্তকে দেখতে পাই। এই প্রবল যুক্তিবাদী মানুষটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণায় তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এবং এর সম্পাদনা করেন দীর্ঘ বারোবছর (১৮৪৩-৫৫) ধরে অত্যন্ত সুনাম, দূরদৃষ্টি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে। ধর্মীয় চিন্তায় তো বটেই রাজনৈতিক দিক থেকেও তাঁর এই কাজের একটি বিশেষ তাৎপর্য সে যুগে তো ছিলই আজও বোধকরি আছে। সমাজসংস্কার বিষয়ক তাঁর নানা

চিন্তা, নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রকাশ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও তথ্য সহযোগে দুরূহ প্রশ্নের গ্রন্থিমোচন প্রক্রিয়া আমরা এই পত্রিকাটিতেই দেখতে পাই। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতাতেই তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী ধারণ করেছিলেন।[২৭] এদেশের নীলকর আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, পাদ্রী লঙ্ সাহেব প্রমুখদের নাম উচ্চারিত হলেও অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মারফৎ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নীলকর প্রতিরোধকর্মে বঙ্গদেশে তিনিই পথিকৃৎ।

'তত্ত্ববোধিনী'র আগে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রসন্নকুমার ঘোষের সাথে তিনি 'বিদ্যাদর্শন' নামে অন্য একটি পত্রিকার সম্প্রচার আরম্ভ করেন। এই দুটি পত্রিকাই ছিল রাজনৈতিক চিন্তা ও তাঁর মত প্রকাশের মুখ্য বাহন।

অক্ষয়কুমার মনে করতেন রাষ্ট্র সমাজেরই প্রতিরূপ। সমাজের মনন, জিজ্ঞাসা, কর্মপদ্ধতি, সমস্তই রাষ্ট্রের কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সমাজে যাই প্রতিফলিত হোক না কেন তাই রাষ্ট্রের মাধ্যমে জাতির জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেখানে রাষ্ট্র দুর্বল ও শক্তিহীন সেখানে রাষ্ট্রের অধীন সমস্ত সম্প্রদায় নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন দল বা চক্রে বিভক্ত হয়ে বা একাধিক গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও একটি পরিবারভুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত 'ধর্মনীতি' গ্রন্থে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। আমাদের রাজনৈতিক জীবনও এরকম গোষ্ঠী থেকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় রূপান্তরের উপযোগী বলে মনে করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত।[২৮] অর্থাৎ নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের স্বাতন্ত্র্য ডিঙিয়ে আমরা 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীড়'-এর যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে পেয়েছি, তার রাষ্ট্র-নৈতিক অবয়বটি অক্ষয়কুমার বহুপূর্বেই ধরে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার এক পূর্বসূরি সম্ভবত অক্ষয়কুমারও। গণতান্ত্রিক চিন্তার কিছু উচ্চতর স্তরেও অক্ষয়কুমার বিচরণ করেছিলেন। দেশের শাসনক্ষমতায় যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হন তিনি তাকে বলেছেন জনপ্রতিভূ মাত্র। সাধারণের ইচ্ছানুসারে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন। কাজেই যে সরকার জনগণের প্রতিনিধি, সেই সরকারের দায়িত্ব জনসেবা করা। তাদের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করা। এই মনোভাব উচ্চস্তরের গণতান্ত্রিক

ভাবনাপ্রসূত। এই ভাবনাসূত্রেই অক্ষয়কুমার মনে করতেন আমাদের দেশের ইংরেজ সরকার এই মুখ্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম। কেননা ইংরেজ প্রশাসনে সুশাসন, সুবিচার ও সুনীতির প্রয়োগ বলে কিছু নেই। সমস্ত শাসন ব্যবস্থা যেন একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন,—'প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ সিংহ ব্যাঘ্রাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়।'[২৭] রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসক সরকারের চরিত্র যেখানে স্বার্থপরতা ও দ্বেষমূলক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন সেখানকার সরকার সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কোনরকম বিধিবদ্ধ আইন এমনকি দেশশাসনের জন্যে কোন করও আরোপ করতে পারেন না বলে মনে করতেন অক্ষয়কুমার। কারণ দেশের নিরাপত্তা বা সুবিচার যেখানে কিছুই নেই সেখানে জনগণের উপর কর স্থাপনের রাজনৈতিক অধিকারও সেই সরকারের থাকা উচিত নয়। এই নৈতিক অবস্থানটি লক্ষণীয়। সে সঙ্গে তিনি মনে করতেন ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল। যেহেতু ব্যক্তি গোষ্ঠীরই অংশ সেহেতু গোষ্ঠীর অভাব লাঘবের অর্থ ব্যক্তিস্বার্থের অভাব পূরণ। কেবল দেশের জনসাধারণের ধনসম্পদ রক্ষা করা অথবা বৈষয়িক উন্নতি করাই সরকারী কর্তব্যের শেষ কথা নয়; সেই সঙ্গে তাদের মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক উন্নতিসাধন করাও সরকারী দায়িত্বের অন্যতম প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা অনুভব করতে পারি যে এক উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড থেকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অক্ষয়কুমার ইংরেজের ভারতশাসনকে মূল্যায়ন করেছেন। ইংরেজের নিজের দেশে গণতন্ত্র এবং ভারতে সাম্রাজ্যবাদ এই দ্বিমুখী আচরণের সারশূন্যতাও অক্ষয়কুমার বারবার স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর সমস্ত লেখনীই ছিল গুরুভার, প্রশ্নবিদীর্ণ ও গম্ভীর। সেজন্যে অক্ষয়কুমার দেশবাসীর মধ্যে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দুরূহতার জন্যে কোনো দৃঢ় ছাপ ফেলতে পারেন নি।

এ ছাড়াও অক্ষয়কুমার এক নির্মোহ, যুক্তিবাদী মন নিয়ে এদেশের সামাজিক কুপ্রথাসমূহকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি এই প্রথা-সমূহকে নির্মূল করতে তিনি সরকারী হস্তক্ষেপেরও পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তিনি প্রায় বিদ্যাসাগরের সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন। এই দুজনেই

বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ যে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী তা মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। অক্ষয়কুমার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'বাল্যবিবাহ মহাপাপ'। প্রায় বিদ্যাসাগরের সমান তেজ নিয়ে তিনি এ সব সামাজিক কুপ্রথাকে আক্রমণ করেছেন। লিখেছেন—'এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য ও অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহ কোনরূপেই কর্তব্য নহে।'[২৭]

এই অনাচারকে উপড়ে ফেলতে তিনি এমনকি সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতেও দ্বিধাহীন ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'এই রীতি রহিত করণার্থে এতদ্দেশীয় প্রভুত্বশালী সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণপণে যত্ন করা কর্তব্য।'[২৮] এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অক্ষয়কুমারের দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র ইংরেজ-প্রতিশোধন প্রচেষ্টাতেই সমাপ্ত হয়নি। দেশের কুপ্রথা বিমোচনেও তিনি ছিলেন সমান উদ্যোগী এবং দ্বিধাহীন। অর্থাৎ দেশের বাইরে এবং ভেতরে দুই অঞ্চলেই তাঁর দৃষ্টি অনাবিলভাবে প্রসারিত হতে পারতো।

শুধু কুপ্রথা বিমোচন নয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনযোগ্য। শিক্ষার প্রসারই সামাজিক ব্যাধিসমূহকে উচ্ছেদ করতে পারে এ কথা সেকালের সমস্ত বিদ্বান মানুষদের সঙ্গে অক্ষয়-কুমারও বিশ্বাস করতেন। তিনি লিখেছেন—'সর্বসাধারণের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন ব্যতিরেকে এ সমস্ত কুরীতি প্রতিবন্ধক নিবারণের আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচারই দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের বিদ্যাজ্যোতি প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধি করা সর্বাগ্রে কর্তব্য।'[২৯] এই 'বিদ্যাজ্যোতি'র জন্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষেও তাঁর সায় ছিল। কারণ সেই পথেই যাবতীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষাকে দেশের প্রতিটি কুটিরে কুটিরে ছড়িয়ে দেওয়া ইংরেজ শাসনকর্তাদের অন্যতম দায়িত্ব বলেও মনে করতেন—'তাঁহাদের রাজ্যের সর্বস্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধেয়, অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সেইরূপ কর্তব্য।'[৩০] এই জন্য শিক্ষাগ্রহণকে আবশ্যিক করা এবং দরিদ্রদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা প্রবর্তনের কথাও তিনি বলেছিলেন। অক্ষয়কুমারকে পিতৃবিয়োগের কারণে

উনিশ বছর বয়সেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্যালয় ত্যাগ করে বিষয়কর্মের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি যে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রধান কর্তব্য তাই নির্ধারিত হলো দরিদ্রের সন্তানের বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থায়। পরবর্তীকালে শিক্ষাচিন্তা তাঁর আরও আক্রমণাত্মক হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারে নিয়োজিত না হবার জন্য রাজপুরুষদের তিনি স্পষ্টভাবে নিন্দা করেছেন। লিখেছেন অনর্থক যুদ্ধ বিবাদ করে রাজপুরুষদের রাগারাগির কারণে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচুর অর্থক্ষয় হচ্ছে। তেমনি স্বদেশবাসীরা যে অনর্থক 'অপবিত্র আমোদ' করে 'রাশি রাশি মুদ্রা জলাঞ্জলি' দেন সে কথাও তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি। অনেকটা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাহাকার যেন আমরা তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই যখন তিনি লেখেন—'স্বরূপ সাজ্যাতিক গরল গলাধঃকরণ করনার্থ যে রাশ রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জল ও ধর্ম ভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশ্যে ব্যয় হইলে, জনসমাজ কতদিন আর এরূপ শ্রীহীন থাকে।'[৩১]

বস্তুত দেশের মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা, কুপ্রথার বিলোপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের যে স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত[৩২] তা আজও আধুনিক। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে বহুবিবাহ ইত্যাদি দু-একটি ছাড়া অধিকাংশই আজও আমাদের দেশের গভীরে তেমনই প্রোথিত আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পথ ধরে অক্ষয়কুমার সাংবাদিকতার সূত্রে যে স্বদেশচিন্তার পরিচয় রেখেছেন তা শুধুমাত্র চিন্তা হিসেবেই নয়, স্বদেশমুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবেও আজও অনুধাবনযোগ্য। অক্ষয়কুমার লেখনীসূত্রে বঙ্কিমের অগ্রজ। বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকালেই অক্ষয়কুমার বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনা করেছেন। সুতরাং অক্ষয়কুমারের মননের প্রভাব বঙ্কিমপূর্ব ভারতচিন্তাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। আমরা অক্ষয়কুমারের স্বদেশচিন্তার পরিমণ্ডলটি সংক্ষেপে অবলোকন করে নিলাম। স্বদেশ-চিন্তার যে ভিত্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব সৌধ নির্মাণ করেছিলেন এই দ্রুত নিরীক্ষণে তার একটি প্রধানতম অঞ্চলের প্রাথমিক জরিপ করা গেল।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বলেছেন,

> 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।'

এই সশ্রদ্ধ উক্তি থেকেই রামগোপাল ঘোষের একটা প্রাথমিক পরিচয় আমরা পাই। বস্তুত খুব অল্প বয়সেই রামগোপাল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বিদেশী ইংরেজ সরকারকে বর্জন করে আমরা ভারতবর্ষ খুব ভালোভাবেই শাসন করতে পারি। তাঁর এই উপলব্ধির প্রেক্ষাপটটি বুঝিয়ে লিখেছেন শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে। ভূদেব লিখেছেন—

> 'তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙালী (রামগোপাল ঘোষ) ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য বিষয়ে সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এই দেশীয় লোকেরা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না ; আর ইহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবী পরিবর্তন সমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।'

অর্থাৎ সৃজনশীল এবং স্বনির্ভর ধর্মীয় যুক্তিবাদের যে ধারা সে যুগে গড়ে উঠেছিল তার কৃতিত্ব ও সাফল্যকে সামনে রেখেই রামগোপাল প্রমুখ দেশ-বাৎসল্যের নেতারা তখন দেশহিতের উপায়সমূহ দেখতে পেরেছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের চিন্তাতেও স্বদেশপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি উচ্চতর ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সে আলোচনায় আমরা যথাসময়ে যাবো। বর্তমানে শুধু এটুকু বলে রাখি যে রামগোপাল সম্ভবত ধর্ম ও দেশপ্রীতির সম্মেলনের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। তবে সে যুগের যে সর্বজন পরিব্যাপ্ত দ্বিধা, ইংরেজের আবাহন নাকি বিদূরণ কোনটি ভারতবাসীর কাঙ্ক্ষিত এই প্রশ্নে যে দ্বিমুখী প্রবণতার অস্তিত্ব তখন দেখা যেত, রামগোপালও অল্পাধিক তাতে

আক্রান্ত ছিলেন। সেজন্যেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভার রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য হয়—'(He) should bitterly deprecate any event, which should weaken the ties' (The Bengal Hurkaru, Monday, April, 24, 1843, Vol. XXXI, No 97. P 387). অন্যদিকে তিনিই বন্ধু গোবিন্দ বসাকের কাছে ১৮৩৮ সালে লেখা পত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদনের বদলে 'active measures' নেবার পরামর্শও রাখেন। অর্থাৎ ইংরেজ সম্পর্কে স্থিরসিদ্ধান্ত অনেকের মতো তখনো রামগোপালেরও ছিল না। প্রীতি ও ঘৃণার দ্বন্দ্বে তিনিও দোদুল্যমান ছিলেন।

ইংরেজের ভারত-অধিকারের সমর্থক রামগোপাল ঘোষ ভারতবাসীর স্বার্থের কথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। হরিশ স্মৃতি সভায় এ সম্বন্ধে এক ভাষণে তার প্রমাণ আছে।

'In a country like this, under a Government such as they had, it was impossible to expect native talent and native genius to be appreciated and promoted. They were not living in a free country ; nor under a representative Government. He did not find fault with the existing rule, perhaps it was the best they could have under present circumstances, but with an exclusive civil service and no outlet for career there was no stimulus to exertion.' (Speeches of Ram Gopal Ghosh. July 12, 1860 P-20. Cotton Press. Calcutta).

এ ছাড়াও রামগোপাল ঘোষ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষকে গড়তে হলে দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কাউনসিল অব এডুকেশনের কাছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রেভিনিউ কালেকটারের অধীনস্থ না রেখে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্যে প্রস্তাব করেন। সে সঙ্গে শিক্ষাকে দেশের সাধারণ মানুষের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্যে তিনি ইংরেজি ভাষার বদলে বাংলাভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। এই প্রস্তাব দুটিই গভীরভাবে ভেবে দেখবার মতো। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বদলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে তিনি চেয়েছিলেন। তেমনি চেয়েছিলেন সাধারণ্যে শিক্ষার প্রসার। সেই

উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব। দুটি প্রস্তাবই তাৎপর্যপূর্ণতো বটেই, আধুনিকও।

দেশের জনসাধারণকে সচেতন ও রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলতে হলে সংবাদপত্রের যে প্রয়োজনীয়তা আছে একথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় তিনি একটি মাসিক বাংলা ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশনারও আয়োজন করেছিলেন। অন্যান্য ইয়ং বেঙ্গলদের মতো রামগোপাল ঘোষও চেয়েছিলেন যেন শিক্ষিত ভারতীয়রা জুরি পদে বসে ইউরোপীয় বিচারকদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বিচার-কর্মের অধিনায়কত্ব করতে পারেন। ব্রিটেনের আইন পরিষদে ভারতীয়দের মতামতকে তুলে ধরার বিষয়ে তিনি ২৯শে জুলাই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে এক সভায় একটি প্রস্তাবগুচ্ছ পেশ করেন। প্রস্তাবসমূহের সমর্থনে বলতে গিয়ে তিনি বললেন—

'Constitution of the Legislative Council is to be such that native view, native feelings and native talents, are not to be represented in it at all. I do not pretend to say, nor have I ever pretended to say that the natives should have a preponderance of votes in that Council. But I contend that no one can sufficiently understand the customs, sentiments and prejudices of the natives of this country without being a native himself. To a foreigner, however, intelligent and however observant, this will be the study of a lifetime'.

রামগোপাল ঘোষের এই অভিমতকে সমর্থন জানাতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু মতিলাল শীল। বঙ্কিমচন্দ্রও পরবর্তীকালে ঠিক এ রকম কথা একাধিক ক্ষেত্রে বলেছেন। লোকরহস্যের 'Bransonism' নকশাটির মূল কথাও ঐ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রামগোপাল ঘোষ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে দেশের যুব সমাজকে বিশেষ করে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে সমর্থন করেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন যে দেশগঠনের প্রয়োজনে এবং মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনার্থে শিক্ষাই প্রাথমিক প্রয়োজন। রাজনীতি ও শিক্ষা একই সূত্রে গ্রথিত হওয়া অন্তত ছাত্রজীবনে অসম্ভব এই ছিল তাঁর অভিমত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভায় এ বিষয়টি তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন—

'It was almost impossible that at one and the same time they could do their duty to the society, and their duty as students.' (Bengal Hurkaru, Monday April 24, 1843, Vol. XXXI, No. 97) শিক্ষার প্রসারে রামগোপাল কি পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এই উক্তিটি থেকে তা বোঝা যাবে।

এই স্বল্প পরিসরে রামগোপাল ঘোষের চিন্তাজগতের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। আমরা বঙ্কিম প্রসঙ্গের সূত্রে তাঁর স্বদেশপ্রীতির দু-একটি প্রান্তকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে নিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের সূত্রে রামগোপাল ঘোষের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন। আমরা আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সে উল্লেখের দু-একটি হেতু অবলোকন করার চেষ্টা করে নিলাম।

জর্জ টমসন (ভারতে আগমন-১৮৪২)

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক, বাগ্মী ও পার্লামেন্টিরিয়ান জর্জ টমসনের ভারতপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিয়ে দেশে ফিরলেন ১৮৪২ সালে। ভারতবর্ষে পৌঁছে টমসন এদেশের নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুচরণ সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই টমসন বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসকদের দিক থেকে রাজনৈতিক ন্যায়, সামাজিক সুব্যবস্থা, বৈষয়িক সহায়তা প্রভৃতি বিশেষ পাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে ১১ই জানুয়ারী ১৮৪৩ খ্রীঃ এদেশের ওপর তাঁর প্রথম প্রারম্ভিক ভাষণে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তিনি বলেন—

> 'এতদ্দেশের শাসনের উৎকর্ষাপকর্ষে ইংলণ্ডীয় লোকেরা যাহাতে পরমেশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী বোধ করেন তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ মনোযোগ করিয়াছি, যাঁহাদিগের হস্তে শাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা অতি বিবেচক সৎকর্ম্মশালী এবং সুবিচারক হইলেও ইংলণ্ডীয় লোকেরা উক্ত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, ⋯যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদ্দেশ শাসন করেন⋯তাঁহাদিগের এদেশের সদ্বিচার এবং উত্তমরূপে শাসনের উপায় করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে।

কিন্তু তাঁহারা এখনকার যথার্থ বৃত্তান্ত অনবগত প্রযুক্ত তৎকরণে অক্ষম।" (দ্র- বেঙ্গল স্পেকটেটর, ফেব্রুয়ারী ১৮৪০, চতুর্থ সংখ্যা।)

এরপর তিনি বঙ্গদেশের তরুণ ও বিদ্বানদের চারটি বিষয়ে নিবিষ্ট হতে অনুরোধ করে যান। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয় চারটির উল্লেখ করেছেন। প্রথম উপদেশ—সকলের একবাক্যে দেশহিতকর্মে নিয়োজিত হওয়া। দ্বিতীয় উপদেশ—স্বদেশের পুরোনো ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ভালো করে জানা। তৃতীয় উপদেশ—সরকারী ব্যবস্থাসমূহের ভালোমন্দ সম্পর্কে মতপ্রকাশ করা। চতুর্থ—ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতায় আস্থা রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া।

এই উপদেশসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের বালক বয়সের বড় ইংরেজের পরামর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চায়, নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে রচনার আগ্রহে হয়তো এই উপদেশের অনুপ্রেরণা ছিল। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস' নিবন্ধে এই অনুমান করেছেন। বস্তুত টমসনের পথনির্দেশ শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, প্যারীচাঁদ মিত্র ('The Jaminder and the Ryot') এবং রমেশচন্দ্র দত্তকেও ('The peasantry of Bengal') অনুপ্রাণিত করেছিল।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১)

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশচিন্তার কথাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিও অল্পবিস্তর বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে যুগের প্রধান প্রধান মনীষীদের[৩৩] মতো ভারতবাসীর স্বার্থে ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন ইংরেজ দেশে আইন শৃংখলা এনেছে। বিশৃংখলার অবসান করেছে। জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেছে।[৩৪] কিন্তু ইংলণ্ডে নিজের দেশবাসীর জন্য একরকম শাসন এবং ভারতবর্ষে ভারতবাসীর জন্য অন্যরকমের শাসন এই দ্বিমুখী নীতির তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বিচারব্যবস্থায় এবং আইন প্রণয়নে এই দ্বিমুখীনতার অবসান চেয়েছিলেন। এমনকি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী ও ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পেট্রিয়টে ভারতীয়রা নিজেরাই যেন

নিজেদের প্রয়োজনে কিছু আইন প্রণয়ন করতে পারেন সেই দাবীও করেন। বিলাতের পার্লামেন্টের অনুকরণে এদেশে কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে পার্লামেন্টের শাসন চালু করার জন্য এই সময়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল। হরিশচন্দ্রও পার্লামেন্টের সামনে ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ ভারতবাসীরা নিজেরাই স্থির করবে এবং নিজেদের ভালোমন্দ দেশবাসী যত ভালো বুঝতে পারবে বিদেশী ইংরেজ সরকার তত ভালো বুঝতে পারবে না, এই মর্মে আন্দোলন শুরু করলেন। এ ছাড়াও শাসনসংক্রান্ত কাজে ও সিভিল সার্ভিস পদে ভারতীয়রা বসতে পারবে না—ইংরেজ সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধেও তীব্র আপত্তি জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রেও তিনি প্রশ্ন তোলেন।[২২] এ ব্যাপারে তিনি রামমোহনেরই সমধর্মী ছিলেন। রামমোহনের মতো তিনিও ভারতে বিধিবদ্ধ ফৌজদারী আইনের বিরোধী ছিলেন। এবং এদেশীয়রাও যাতে বিচারকের পদে হাইকোর্টে বসতে পারেন তার চেষ্টা চালিয়েছেন। বৃটিশ শাসনের নানা দিক্ সম্বন্ধে হরিশচন্দ্রের মতানৈক্য থাকলেও ইংরেজের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন এই ব্যবস্থার ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মধুসূদনের স্বাদেশিকতাবোধ অত্যন্ত প্রখর। বিদেশের ভাষা শিখে, বিদেশীর ধর্ম গ্রহণ করে, বিদেশী কবির মতো কাব্যরচনা করে, তিনি তাঁর জীবনের প্রথমে স্বদেশবিমুখতার যে একটি কৃত্রিম আয়োজন করেছিলেন : সে আয়োজন যে ব্যর্থ হয়েছে তা আমরা খুব সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝতে পারি তাঁর সমাধিলিপি থেকে ; —যেখানে যশোরের সাগরদাঁড়ির দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন বঙ্গজননীর কোলে শিশুর মতো বিরাম লাভ করেন। বস্তুত স্বদেশানুরাগের বোধটি সেযুগের যে-কোন শিল্পীর পক্ষে কি রকমের অমোঘ ও দুর্লঙ্ঘ্য ছিল মধুসূদনের শিল্পীজীবন অনুধাবন করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরও তাঁর মনে পড়েছে 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজার কথা', 'কপোতাক্ষ নদ', 'নদী তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'ঈশ্বরী পাটনী' প্রমুখ বিষয়। এ সব মধুসূদনকে সুদূর ইতালিতেও তাড়না করে ফেরে। ইতালিতে বসেই 'ভারতভূমি' নামে যে

সনেটটি তিনি লিখেছেন তার আক্ষেপ থেকে আমরা মধুসূদনের কবিচিত্তের পরিচয় পেয়ে যাই।

তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাম বা লক্ষ্মণ সম্পর্কে লঙ্কাবাসীর মূল অভিযোগ—এরা পররাজ্য আক্রমণকারী। লঙ্কাবাসীরা যখন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তখন জন্মভূমি রক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পায়—'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে / যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।' এই সংলাপ মূল রামায়ণের সংলাপ নয়। এই উক্তি সৃজিত হয়েছে মধুসূদনের দেশাত্মবোধ থেকে। এ জন্যেই কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন মধুসূদনের সম্বর্ধনার আয়োজন করেন তখন সেই সমাদর গ্রহণ করে মধুসূদন বলেন—'স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম'।[৩৬] তাঁর গদ্য রচনাতেও হেক্টরের উক্তিতে তিনি লিখেছেন—'স্বজন্মভূমির রক্ষাকার্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ ও কর্ত্তব্যকার্য্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়'।[৩৭]

মূলত মধুসূদনের স্বাদেশিকতার কোন বাহ্যিক ঘোষণা নেই। কিন্তু দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রকৃতির প্রতি এক দুর্লঙ্ঘ্য ভালোবাসা থেকে তিনি কখনো মুক্তি পাননি। দেশের প্রতি এই টান তাঁর জীবনের সমস্ত বাহ্যিক প্রসাধন ও আড়ম্বরকে তুচ্ছ করে তাঁকে পরাধীন দেশের এক বেদনার্ত কবিতে রূপান্তরিত করেছে। সেই পরিচয় তাঁর রচনায় কখনো প্রচ্ছন্ন নয় বরং সর্বত্রই সুস্পষ্ট।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭)

দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে প্রথম বড় মাপের আলোড়ন ঘটালেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' (১৮৫৭) 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে / চায় হে কে বাঁচিতে চায়? / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় / হে কে পরিবে পায়?' রাণা ভীমসিংহের কণ্ঠে উক্ত এই কবিতাটি সে যুগে সর্বজনকণ্ঠস্থ হয়েছিল। অমৃতলাল বসু মহাশয় লিখেছেন—'তাঁহার স্বাধীনতা হীনতায় ....'আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি।'[৩৮] বস্তুত হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যে' অসুরদের স্বর্গলোক অধিকারের বর্ণনায়, নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' কাব্যে (১৮৮৭) জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ মুক্ত এক ভারতবর্ষের কল্পনায় এমনকি সেকালের যাত্রা

ও হাফ-আখড়াই গানেও স্বাদেশিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।[৩৯] হিন্দুমেলার সূত্রেও দেশাত্মবোধ তখন ব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৯৪)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। হিন্দু কলেজে ছিলেন মাইকেলের সহপাঠি। তবে মাইকেলের মতো ইংরেজির সম্মোহনে তিনি ইংরেজ বনে যান নি। বরং ইংরেজিসাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও ইতিহাস তাঁকে আরো ভালো করে ঘরে ফিরিয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারে ও দেশের মানুষগঠন করার কাজে উদ্দীপিত করেছিল। বিচিত্র দিক থেকে সম্পদ আহরণ করে ভারত-মানস-গঠনের যে প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী মাত্রেরই[৪০] বৈশিষ্ট্যঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সে লক্ষ্যের এক প্রধানতম পথিক। সে জন্যেই পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত স্বদেশমুখীনতা ও পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা তাঁকে পশ্চিমী ভাবস্রোতে ভেসে যেতে দেয়নি। এ জন্যেই জাতির প্রাচীন গৌরবকে রক্ষাকল্পে সেদিন যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু[৪১] ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম। এই দুজনেই জন্মেছিলেন এক বিরাট পরিবর্তনের যুগে। তারপর বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমে ও দেশহিতকর্মে প্রবৃত্ত করে তুলতে এঁদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। রাজনারায়ণ যেমন 'সেকালের কথায়' অনুকরণকে বিদ্রূপ করেছেন। ভূদেবও তেমনি পরানুকরণের হাত থেকে স্বদেশবাসীকে রক্ষা করার জন্যে 'শিক্ষা দর্পণ' এ লিখলেন—'এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনুচিকীর্ষার যে প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে, তাহারও একটা হেতু ঐ স্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা। আমরা অন্য জাতীয় লোকের বিষয়ে যাহা দেখি, শুনি বা অধ্যয়ন করি, অবিকল তাহারই অনুসরণ করিতে ধাবমান হই, আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি, দেশের অবস্থা এবং বর্তমান সামাজিক প্রণালী কিরূপ, তাহা সবিশেষ জানা থাকিলে কদাপি ঐরূপ কাপুরুষের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।······দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সকল নিয়মেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে। 'কৃতবিদ্যেরা' যে সকল নিয়ম শিক্ষা করেন তাহা স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইবেন এমন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়েন না।'[৪২] (ভাদ্র, ১২৭৪) স্বাদেশিকতার সঙ্গে মেশানো এই সম্মানবোধ সে যুগে খুব অল্প মানুষের মধ্যেই দেখা যেতো। ভূদেব সেই অল্পেরও অন্যতম। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে

ও মৌলিকতাতেই ভারতবাসী জগৎ-সভায় সকলের সমমর্যাদার আসন লাভ করতে পারে এই বোধ ভূদেবের বরাবরই ছিল। এ কথার প্রমাণ মিলবে তাঁর নিম্নোক্ত কথায়—'যেমন গ্রীক, রোমীয় এবং ইংরাজেরা আপনাদিগের জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নি, আমাদিগেরও সেইরূপ করিয়া চলা উচিত। সাহেবদিগের স্থানে শিক্ষালাভ করায় কোন হানি নাই অনেক উপকারই আছে কিন্তু সাহেবী বই পড়িয়া একেবারে সাহেব হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপর, নীচাশয় আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির কার্য্য।'[৫০] (চৈত্র, ১২৭৩) ভূদেবের চিন্তার এই সরল, নির্ভীক ও সুস্পষ্ট মৌলিকতার জন্যে তিনি অনেক ইংরেজ শাসকের ধন্যবাদের পাত্র হন। ১৮৭৩ সালে রেঙ্গুন থেকে ইডেন সাহেব তৎকালীন বাঙলার গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবকে ভূদেব সম্পর্কে যে পত্র দেন তার থেকেই এ সম্পর্কে জানা যায়।[৫১]

তবে ভূদেবের বড় পরিচয় তাঁর শিক্ষাচিন্তাতেই বিধৃত। অক্ষয়কুমার, হরিশচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথও দেশের শিক্ষা বিষয়ে কম ভাবেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে ভূদেবের স্থান সে যুগে সর্বোচ্চে ছিল। তাঁর চিন্তা এ বিষয়ে যেমন ব্যাপক তেমনি সুদূরপ্রসারী।

তিনি মনে করতেন স্বদেশের মানুষকে স্বজাতিপ্রবণ করে তুলতে হলে শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ধর্মীয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রসমূহের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাঁর মতে জাতীয়চরিত্র গড়ে তোলার জন্য দেশীয়প্রথা, ধর্মভাব, সংপ্রবৃত্তিসমূহ শেখানো আবশ্যক। তাঁর কার্যকালে এই লক্ষ্য অনুসারে তিনি বঙ্গদেশের নানা দিকে বহু শিক্ষা প্রাতষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৫২] এ ছাড়াও শিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজেও অর্থদান করেছেন।

নিজের প্রৌঢ় বয়সে লেখা 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের কর্তব্যনির্ণয় অংশে ভারতসমাজে দুটি ভয়ের কারণ তিনি নির্দেশ করেন। প্রথমে 'বিদ্যাহীনতা' তারপর 'ধনহীনতা'। বলেছেন উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যে জীবনকে পুণর্গঠিত করে তুলতে হলে শিক্ষার উন্নতিসাধন প্রয়োজন। প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সম্মেলনও প্রয়োজন।[৫৩]

তিনি মনে করতেন বৃত্তিমূলক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষকে আত্মনির্ভর ও পারদর্শী করে তোলে। গড়ে তোলে উন্নতরুচিবোধ, নতুন কর্মোদ্দীপনা যা তাদের অর্থাগমের পথকে সুগম করে। কাজেই বিদেশী শাসকদের অধীনে

চাকরী করা থেকে স্বাধীনভাবে বৃত্তিমুলক কাজে নিযুক্ত হওয়া স্বদেশবাসীর পক্ষে অনেক বেশী শ্রেয়। তাই তিনি বলেন—'চাকুরী দ্বারা বিশিষ্ট প্রভুত্ব হয় না, অর্থাগমও অধিক হয় না, দেখিলেই লোকে বৃত্ত্যন্তরে নির্ভর করিবে এবং জনসাধারণ আপনাপন পরিশ্রম দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা করিতে পারিলেই স্বাধীন স্বভাব, উদার প্রকৃতি এবং কার্য্যে তৎপরমতি হইবে।'[৩৭] বাঙালি এই উপদেশ শিরোধার্য করে নেয়নি বলেই বঙ্গদেশের আজ এই দুর্গতি। ভূদেবের এই উপদেশের প্রতিধ্বনি আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মুখে পরে বহুবার শুনেছি। তবে আচার্যের যুগে এ উক্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ভূদেব এই কথা বলেছিলেন তাঁর সমাজবিশ্লেষণ থেকে, তাঁর দূরদৃষ্টিপাতের প্রজ্ঞা থেকে।

রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বুঝেছিলেন যে গ্রামের উন্নতি না হলে সমগ্র দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। পল্লীজীবনে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ভূদেব 'শিক্ষাদর্পণ' ও 'সংবাদসার' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১২৭৪ পৌষ এই পত্রিকার প্রথমসংখ্যার প্রস্তাবনায় তিনি লেখেন—'পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পারেন না। তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলি ও নিমন্ত্রণের কথা হইয়া থাকে। অতএব গ্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাদৃশ লোকদের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। সংবাদপত্র কিছু পুরাতন হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে।'[৩৮]

ভূদেবের শিক্ষাচিন্তার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নেই। আমরা শুধু তাঁর প্রবণতাসমূহ একটু দেখে নিলাম। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বদেশের উন্নতির জন্যে, বিশেষ করে দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে ভূদেব যে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন সেদিক থেকে তিনি এদেশের প্রধান এক শিক্ষাগুরু এবং ঊনবিংশশতাব্দীর অন্যতম ভারতপথিক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনাতে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার এক পূর্বসূচনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তায় থাকা অসম্ভব নয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই প্রথম বাঙালি লেখক যাঁর সাহিত্যরচনায় (গল্পে, প্রবন্ধে) ভারতচিন্তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখা 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' দুটি কাহিনী আছে। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'।

অঙ্গুরীয় বিনিময়'-তে শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব কন্যা রোশিনারার প্রণয় কাহিনী মুখ্যস্থান গ্রহণ করলেও কাহিনীর অন্তরালে সুস্পষ্টভাবে জন্মভূমির প্রতি যে প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তার মাধ্যমেই ভূদেবের স্বদেশচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৯]

জন্মভূমি ভারতবর্ষকে তিনিও একটি দেবীপ্রতিমা রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের পরিচয়ে তিনি লিখেছেন—মার্কণ্ডেয় মুনি 'ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, 'ইনি কোন্ দেবী?' মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গে করিয়া 'তীর্থদর্শন' করাইতে কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী হইয়া কুমারিকা দিয়া কামাখ্যায় লইয়া গিয়া এই গ্রন্থের শেষে বলিলেন 'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির দর্শন প্রাপ্ত হইবে।' অর্থাৎ ভারতবর্ষই অধিভারতী দেবীর ভৌতিক মূর্তি। তীর্থদর্শনেই তাঁহার পরিক্রমণ করা হয়।"[৬০] বাংলা সাহিত্যে ভারতভূমিকে দেবী রূপে কল্পনা করা এই বোধকরি প্রথম। 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের ছয় বৎসর আগে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো এক্ষেত্রে 'পুষ্পাঞ্জলি' থেকে পরবর্তীকালে প্রেরণা পেয়েছেন।[৬১]

বস্তুত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশচিন্তায় স্থান পেয়েছিল এক অখণ্ড ভারতবোধ। ভারতবাসীর সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত মানুষের মিলনের উপযোগী এক স্বদেশচিন্তাকে তিনি খুঁজেছিলেন। এই চেতনায় কোনরকম সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয় পার্থক্য, জাতিবৈষম্য স্থান পায়নি। ভারতবাসী বলতে তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের প্রতিটি সম্প্রদায়কে। স্বদেশ বলতে তিনি চিনতেন জন্মভূমিকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানের কাছেই। ভূদেবের নিবাস চুঁচুড়ায়, বঙ্কিমের জন্ম এবং যৌবন পর্যন্ত কালযাপন নৈহাটিতে। মাঝখানে গঙ্গা। হয়তো কালস্রোত প্রবাহের তীরে, বাসস্থানের নৈকট্যের মতো, চিন্তাক্ষেত্রেও উভয়ের ঘনিষ্ঠতাই ছিল। অভিজ্ঞতারও সাদৃশ্য ছিল। প্রচুর দেশভ্রমণ এবং সরকারী চাকুরীসূত্রে দেশের অন্দরমহলের খবর দুজনেই রাখতেন। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে নদীর দুপাড়েই দুজনের বসবাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনাক্ষমতা বা সৃজনীদক্ষতা ভূদেবের ছিল না। তবে দেশপ্রেম ও স্বদেশহিতের ক্ষেত্রে দুজনের আকাঙ্ক্ষার প্রায় একই প্রকার তীব্রতা ছিল। প্রমথ বিশী মহাশয়ের অনুমান বোধকরি নির্ভুলই। আনন্দ-মঠের মাতৃকল্পনার দু-একটি অগ্নিকণা হয়তো 'পুষ্পাঞ্জলি' থেকেই আহৃত।

তবে এ সব তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে আমাদের প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা শুধুমাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশচিন্তার কিছু নির্বাচিত বিষয় প্রদক্ষিণ করে এলাম। বঙ্কিম-পূর্ব যুগের স্বদেশ চিন্তার পরিবেশটি অনুধাবন করাই আমাদের লক্ষ্য।

এ কালের ইতিহাসের গতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। ১৮৫৮-৫৯-সালে সিপাহীবিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের দুর্বলতাসমূহ বৃটিশ শাসকদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় ভেঙে পড়লো। ইত্যাদি কারণেই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট বৃটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতে স্বশাসন প্রবর্তনের আইন' প্রণয়ন করে বৃটেনের রাণী ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন। এই ঘটনার দু-এক বছরের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে একাধিক কৃষক ও গণবিদ্রোহ দেখা গেল। তারমধ্যে ১৮৫৯-৬২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে নীলকর জমিদারদের নির্যাতন-মূলক দাদন ব্যবস্থার প্রতিবাদে নীলবিদ্রোহ হয়। ওয়াহাবী সম্প্রদায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং ঐ সময়েই। পঞ্জাবে রাম সিং-এর নেতৃত্বে নামধারী শিখেরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে এবং ১৮৭৮-৭৯তে মহারাষ্ট্রের রামুসী উপজাতির লোকজনদের নিয়ে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে এক কৃষকবিদ্রোহ গড়ে তোলেন। প্রায় একই সময়ে মাদ্রাজে গোদাবরীর তীরে রাম্পায় এক স্বতঃস্ফূর্ত কৃষকবিদ্রোহ গড়ে ওঠে। এই প্রত্যেকটি আন্দোলনের হেতু বৃটিশদের জমির কর নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। বস্তুত সাধারণ মানুষদের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধতা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠছিল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছিলেন, কৃষকরাও বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের উপরে নানারকম অন্যায় ব্যবস্থা ও চূড়ান্ত রকমের করবৃদ্ধি আরোপিত হচ্ছে। এ সবের বিরুদ্ধেই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একই সময়ে এ সব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন।

প্রায় একই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূচনাও হোল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ সালে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত সংগঠিত

প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনারই প্রভাব বঙ্কিম রচনায় পড়েছে। সুতরাং এই বিষয়সমূহ একটু সংক্ষেপে দেখে নেবার প্রয়োজন আছে।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন আহূত হয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তুলবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরোজী ও বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষীরা। কংগ্রেসের আগে উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই কলিকাতায় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' এবং বোম্বাইতে 'প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশান' সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই সমস্তই ছিল বণিক ও জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার একটি মঞ্চ বিশেষ। কংগ্রেস গঠিত হবার আগেই বাংলায় দীনবন্ধু মিত্রের নাটক (নীলদর্পণ) এবং নীলচাষ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন বিষয়ে নানা আলোড়ন শুরু হয়েছিল। ফলে নীলচাষের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে নতুন আইন করতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে লর্ড লিটন (১৮৭০-৮০) প্রবর্তিত সংবাদপত্রের সে-সব বিধিকে লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪) কর্তৃক প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। এই সামান্য কিছু সফলতা সেযুগে ভারতবাসীকে ইংরেজের সঙ্গে নানাবিষয় নিয়ে একটু দরাদরির স্তরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রবণতা থেকেই কংগ্রেসের সূচনা।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে কংগ্রেস প্রায় কোন তাৎপর্যই অর্জন করতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগের বছর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নৌরোজী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করলেন, সরকার যেন দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ হয়। তারপর কি ধরণের ন্যায়পরায়ণতা নৌরোজী ইংরেজের কাছে প্রত্যাশা করেন একথা বলতে গিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও আইন-শৃংখলার প্রশ্ন তোলেন। এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় কংগ্রেসের দাবীর স্তর। কংগ্রেস তখনও একজন ইংরেজকে (হিউম) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে রেখেছে। সে সঙ্গে অনুনয় ও মিনতির স্তরে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অধীনতামুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্জ্বলিত কতিপয় স্ফুলিঙ্গ মাত্র দেখেছেন। দেশ স্বাধীন করবার কোনো সুসংগঠিত উদ্যোগ তাঁর কালে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—'তুমি কষে ধরো হাল। আমি তুলে বাঁধি পাল' ('তাসের দেশ' উৎসর্গ)।

দেশনেতা ও দেশপ্রেমিক-কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে দায়িত্বের এই পারস্পরিক নির্ভরতা থাকে। দেশের নেতা কষে হাল ধরে রাখেন, দেশের কবি স্বাদেশিকতার পালে উদ্দাম ঝড় তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঝড় কতটা তুলেছিলেন তা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাবো। কিন্তু একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থানটি ছিল খানিকটা হতাশার। তাঁর সামনে কোন নেতা বা কোনো সংগঠন ছিলো না যাঁকে উদ্দেশ করে তিনি বলতে পারেন যে, 'তুমি হাল ধরো'। কিন্তু স্বাদেশিকতার পাল বেঁধে সেই পালে হাওয়া লাগাবার দায়িত্ব তিনি যে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদ-সমূহের আলোচনায় বারবার অনুভব করবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. রামমোহন রায়ের জন্মসন নিয়ে নানা মতভেদ আছে। নানা তথ্য ও উৎস থেকে রামমোহনের অনেকগুলো জন্মসন পাওয়া যাচ্ছে যেমন খ্রীঃ অব্দ ১৭৭২, ১৭৭৩, ১৭৭৪, ১৭৭৯, ১৭৮০। এর মধ্যে ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দ কোনোমতেই গৃহীত হতে পারে না কারণ এ-সবের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে ১৭৭২, না ১৭৭৪ কোনটি তাঁর যথার্থ জন্মাব্দ তাই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বাদানুবাদ চলে আসছে। কিন্তু কোন্ সনটি নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যাবে তা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। রামমোহন নিজে কোথাও কোনো প্রসঙ্গেই নিজের জন্মসন উল্লেখ করেননি। ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি অনুরাগী ও অন্তরঙ্গদের কাছে নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু তাঁর থেকেও তাঁর জন্মসন সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর ষষ্ঠ খণ্ডে এ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন (দ্র-প্রথম পর্ব, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯ পরিশিষ্ট-২, পৃ-৪৬১) এ আলোচনায় ২২টি তথ্য উদ্ধার করে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ সালে নাকি ১৭৭৪ সালে তার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। সর্বশেষে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য : ১৭৭২ ও ১৭৭৪ এই দুটি সন বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে, এর কোনটিকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। তবে যতদিন কোন দৃঢ় বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া না যাচ্ছে ততদিন ১৭৭৪ খ্রীঃঅব্দ গ্রহণ করাই উচিত।' আমাদের এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। আমরাও আপাতত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই ১৭৭৪ সালকেই মেনে নিচ্ছি।

২. দ্র-রামমোহন রায় প্রবন্ধ : প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী। পৃঃ ১৯৩

৩. 'To India my native land'—ইংরেজী কবিতা থেকে অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত :

> 'স্বদেশ আমার। কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
> ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
> সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে,
> দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।'

দ্র-দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৪, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ প্রবন্ধ, বিনয় ঘোষ, পৃ-৭৪

৪. দ্র-রামমোহন রায় প্রবন্ধ : প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী পৃঃ ১২৬

৫. The English works of Rammohan Roy, Part IV, 1947, P-21-22.

৬. The Eng. works of Rammohan Roy Part IV (1947) P-21-24.

৭. Raja Rammohan Roy by Sri Prabhat Chandra Ganguli and Prof. Dilip Kumar Biswas. Calcutta (1962) P-308.

৮. The Eng. works of Rammahan Roy—Part IV (1947) P-91. এবং রামমোহন শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ 'The Father of Modern India'—Part II (1933) P—59-60.

৯. জীবনীবিচিত্রা—রামমোহন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃ-২৮

১০. বস্তুত বিপিনচন্দ্র পালের মত মানুষও (১৯২৮ সনেও) এ ধরণের দ্বিধায় ভুগতেন। এর এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে তাঁর ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার আলোচনায়। তিনি বলছেন 'পতিত ভারতের উদ্ধারকল্পেই যে ইংরাজ এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করিতে অগ্রসর হয়, একথা আংশিক সত্য হইলেও ষোল আনা সত্য নাও হইতে পারে।'

—নবযুগের বাংলা (১৯৩৪) পৃ-৫১

বস্তুত কতটুকু সত্য হলে আংশিক হয় এবং তারপর কতটা যোগ করা হলে ষোল আনা সত্য হয়, বা আংশিক সত্যের উল্টোদিকের অবশিষ্টাংশিক মিথ্যাটিকে কেন ষোল আনার মর্যদা দেওয়া হয়না এ সব নানা ধরণের জটিলতায় বিপিন পালের ঐ উক্তি আমাদের নিয়ে যায়। কারণ 'পতিত ভারতের উদ্ধারকালে' ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তার এখানে আলোচনার বিষয়।

১১. দ্র-বঙ্কিম সরণী, প্রথম মুদ্রণ, পৃ-৯

১২. জননী ভারতভূমি আর কেন থাকো তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।

১৩. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪, পৃ-২৬

১৪. ১৮৩২ সালের ডিসেম্বরে 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা' সভা প্রতিষ্ঠিত করেন অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা, এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র পনের বছর। সেই সভায় বাংলাভাষার ব্যবহার ও উন্নতি বিষয়ে তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গভাষার অনুশীলন প্রচেষ্টায় এই সভার স্থান উল্লেখযোগ্য।

১৫. তখনকার শিক্ষিত সমাজে স্ব-ধর্মে অনাস্থা, স্ব সংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা। পরানুকরণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যেত। দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ছিল ঠিক এর বিপরীত

১৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যোগেশ চন্দ্র বাগল। সাহিত্য সাধক চরিতমালাপৃ-৪৪

১৭. আত্মজীবনী—পৃ-১০৭

১৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—যোগেশ চন্দ্র বাগল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. '......But eventually only the attempt launched at the initiative of Allan Octavian Hume succeeded on a permanent basis, and 72 largely self-appointed delegates met for the first session of the Indian National Congress at Bombay in December 1885'.
দ্র-Modern India, Sumit Sarkar, P-88

২০. শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ (কলকাতা ১৩০৫) পৃ-১২-১৩। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের একটি অভিমত। তিনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেন—'তাঁর মতো সমাজপতি যদি সমকালীন মধ্যপন্থী ও প্রগতিশীল সমাজকর্মীদের সঙ্গে একযোগে এগোতে পারতেন, তাহলে তাঁর নেতৃত্বে সমাজ আন্দোলন আরও সুদূরপ্রসারী হতো।' (দ্র-বিদ্যাসাগরের জীবন ও সমাজ ভাবনা প্রবন্ধ, করতলে নীলকান্তমণি, ১৯৮৮, পৃ-১০৫।) বিদ্যাসাগর কেন একযোগে এগোননি তার একটি আভাস উপরের বক্তব্য থেকে আমরা পাই।

২১. শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড (কলকাতা ১৯০৪) পৃ-১৩-১৫

২২. বিদ্যাসাগর পরিচয়—যোগেশচন্দ্র বাগল (পৃ-২৭)

২৩. বিদ্যাসাগর পরিচয়—যোগেশ চন্দ্র বাগল (পৃ-৫২)

২৪. তাঁর চারটি বিখ্যাত রচনা—

ক) পল্লীগ্রা মস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্নন—বৈশাখ ১৭৭২ শকাব্দ।

খ) পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা—শ্রাবণ, ১৭৭২ শকাব্দ।

গ) পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা—অগ্রহায়ণ, ১৭৭২ শকাব্দ।

ঘ) অবিচার—ভাদ্র, ১৭৭৩ শকাব্দ।

বিনয় ঘোষ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১২৯।

২৫. 'ধর্ম্মনীতি' প্রথম ভাগ, দি নিউ সংস্কৃত প্রেস, নবম মুদ্রণ, কলিকাতা ১৮৮৫, দশম অধ্যায় পৃ-১৯৭—১৯৮

২৬. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' শ্রাবণ, ১৭৭২ শকাব্দ, ৮৪ সংখ্যা।

২৭. 'ধর্ম্মনীতি'—অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ-৬৮-৬৯ ; ৮১।

২৮. 'ধর্ম্মনীতি'—অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ-৮৬

২৯. 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'—প্রথম ভাগ, নবম মুদ্রণ, কলকাতা —১৮২৮, পৃ-৮৬

৩০. 'ধর্ম্মনীতি'—অক্ষয়কুমার দত্ত, অষ্টম অধ্যায়, পৃ-১৬৬

৩১. 'ধর্ম্মনীতি'—অক্ষয়কুমার দত্ত, অষ্টম অধ্যায়, পৃ-১৬৭

৩২. 'বিদ্যাদর্শন'—অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৮৪২, ৪র্থ সংখ্যা।

৩৩. রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ সবাই ভারতবাসীর স্বার্থে সে যুগে ইংরেজ শাসনকে কাম্য মনে করতেন। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের স্মৃতিভারে তাঁদের মন বিশেষভাবে পীড়িত ছিল।

৩৪. "The company has carried order where it was chaos, imposed laws on lawless herds of banditti, given security to person & poperty where it was perpetual danger & disturbence, scattered the luxuries of European civilization diffused the blessings of Anglo-saxon energy & industry, founded an admirable system of political equality, brought justice to the poor man's door".

দ্র : 'The Future of Indian Government. The Hindu Patriot Thursday. January 14, 1858, Vol VI. No. 2, P-12.

৩৫. "It is a fact, . .that the vast majority of the inhabitants of this country, the Hindoos, are less actuated by what has been called the antagonism of race than any other nation on the face of the earth. Hindoo judges & juries would give a fairer trial to a British-born offender than any British judge & jury would give a Hindoo offender".—দ্র-Ibid, March 5, 1857, P-76. 'The Black Acts'.

৩৬. মধুসূদনের একটি বক্তৃতা—মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ ১৯৮০, পৃ-৪৩৪

৩৭. হেক্টর-বধ—মধুসূদন রচনাবলী, ঐ, পৃ-৪৩৩

৩৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড,

৩৯. হাফ-আখড়াই গানে মনমোহন বসু হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে রাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে গান লিখেছিলেন—'পঞ্চপাল শ্বেত পুরুষে হেথায় এসে / গ্রাসে দেশের সকল সার ধন / পড়ে রয় খোসাভূমি আগড়া খাস / তাই খেয়ে রয় মোদের জীবন।' ঠাকুর বাড়ীর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন গান লিখেছিলেন—'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে / লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে।' দ্রষ্টব্য দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭, পৃ-১৬৭ রাজ্যেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ।

৪০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

৪১. সে যুগে রাজনারায়ণ বসুকে 'Grand Father of Indian Nationalism' বলা হত। ঋষি অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন এই রাজনারায়ণ বসু। ঁরা তাঁর দৌহিত্র।

দ্র-রাজনারায়ণের কলকাতা—অমরেন্দ্র দাস, সম্পাদনায় শিউলি দাস।

৪২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১৯—২০

৪৩. ঐ, পৃ-১৯

৪৪. ভূদেব চরিত—দ্বিতীয় ভাগ, পৃ-৩৭

পাদটীকা, 'My dear Campbell,

Let me say a word to you on behalf of my old friend Babu Bhoodeb Mookerjee···I am sorry to see that he has fallen under your displeasure but I have known him for many years and I am quite certain he carries more weight with the people than all your

woodrows and civilian Inspectors put together....Natives of this class are rare and I think that they should be encouraged. 'Bhoodeb has a fault and that is that he is a Bengalee...I am sure that you will find that Bhoodeb has many of the higher qualities, of the Europeans and very few of the failings of his countrymen''.

৪৫. ১৮৪৭ সালে 'চন্দন নগর সেমিনারি', ১৮৪৮ সালে হুগলি জেলায় শ্রীপুর স্কুল', বহরমপুরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গে ১৮৭৮ সালে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় পিতার নামানুসারে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন। —'ভূদেব চরিত'-দ্বিতীয় ভাগ।

৪৬. সামাজিক প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, পৃ-২৫০-৫১

৪৭. শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব—চতুর্থ সংস্করণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পৃ-১৪

৪৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ১৩৬৩ সং, পৃ-১৭

৪৯. সেনাপতিকে দেবী ভবানী স্বয়ং স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছেন : 'রে নরাধম! তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহবিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মী শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গো-বধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।'

ভূদেব সর্বপ্রথম সুস্পষ্টরূপে জন্মভূমিকে মা'র সঙ্গে এমন অভিন্ন করে দেখেছেন। প্রথমে দেশের মাতৃকল্পনা তারপর ঐক্যবোধ সহজে আসে।...শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানী ভারতমাতারই একটি রূপ।"

দ্র-বাংলা উপন্যাসে ভারতচিন্তা—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ:৮১

৫০. ভূদেব রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

৫১. শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে "'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'আনন্দমঠ' পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,...পুষ্পাঞ্জলি'র অষ্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পরিচ্ছেদ পাশাপাশি পড়িলেই বাকী সন্দেহটুকু লোপ পাইবে। দুই স্থলেই দেবী মূর্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে মাতৃমূর্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ মাতার আধিভৌতিক রূপ ভারতবর্ষ।"

দ্র-ভূদেব রচনাসম্ভার, ১৩৭৫, সম্পাদকীয় ভূমিকা, বন্দেমাতরম্, জগদীশ ভট্টাচার্য, পৃ-৩০

'পুষ্পাঞ্জলি' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখেছেন—'হিন্দু বিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক ও কেবল

হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা পুষ্পাঞ্জলির গ্রন্থকারের সভক্তিক আলোচনার যে ফল দিয়েছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হীন নহে।'

দ্র-ভূদেব রচনা সম্ভার—প্রমথ নাথ বিশী সম্পাদিত।

৫২. K. Marx, Notes on Indian History, P—186.

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা : প্রথম পর্ব

মৃণালিনী (১৮৬৯)

'কপালকুণ্ডলা' রচনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' লিখেছেন। 'চোখের বালির' পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'নৌকাডুবি'। বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে একবার বলেছিলেন দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পী পূর্বের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম থেকে অগ্রসর না হয়ে বরং পিছিয়ে গেলেন। 'নৌকাডুবি'র (বুদ্ধদেব কটাক্ষ করে বলেছেন ভরাডুবি) প্রসঙ্গ এখানে প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'মৃণালিনী'র প্রসঙ্গ আলোচনা এই উক্তিটি থেকে শুরু করা যেতে পারে। সত্যিই কি 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতম রচনা? পশ্চাদপসারণ? এই উপন্যাসের কোন চরিত্র ঠিকমতো সংগঠিত হয়ে ওঠেনি এই অভিযোগও কি ঠিক? সর্বোপরি স্বজাতির যে ঐতিহাসিক লজ্জার প্রতিবিধানকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন সেই লক্ষ্য এই উপন্যাসকে কতটা সাহায্য করেছে? না কি দুর্বলতার উৎস ওখানেই?

উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে এ বিষয়ে আমরা নানা তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ দেখতে পাই। এই আলোচনার সূচনা হতে পারে মৃণালিনী চরিত্রটিকে নিয়েই। মৃণালিনী উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। তার নামেই উপন্যাস। মৃণালিনীর জীবনের চতুর্দিকে দুর্বিপাক প্রচুর, প্রচুর ঝড়-ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঐ সমস্ত দুর্যোগের মধ্যেও মৃণালিনীকে যেন মানুষ বলে চেনা যায় না। সমস্ত আপদ-বিপদের মাঝখানে থেকেও সে সর্বক্ষণই যেন একটি ঝঞ্ঝাস্পর্শ-রহিত সত্তা। ইতিহাসের ঝড় বা রাষ্ট্রবিপ্লবের প্লাবন তার মনের কোথাও কোনো ছাপ ফেলে না। এভাবে আখ্যানে থেকেও উপন্যাসে না থাকবার কারণ সম্ভবত আছে এই চরিত্রের আদল এবং উপন্যাসের মেজাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই চরিত্রটির আদল রোমান্সের কিন্তু উপন্যাসটির মেজাজ ট্র্যাজেডির। এই দূরতিক্রম্য প্রান্তযোজনার কাজ বঙ্কিম করেছেন অদ্ভুত এক উপায়ে। তিনি উপন্যাসের মাঝখানে রেখেও মৃণালিনীকে কার্যত রেখেছেন উপন্যাসের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষের বাইরে। তাই যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের নানা

ভয়ংকর সব ঘটনার মধ্যেও তার রোমান্টিক অভিযান নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়। কোনো সামান্যতম আঁচড় না লাগিয়েই একটি সরলরেখার গতিতে এই সুন্দরী উপন্যাসের সমস্ত তীক্ষ্ণ উপলখণ্ডকে তুচ্ছ করে কাহিনীর শেষপ্রান্তে অবলীলায় গিয়ে পৌছয়। প্রায় রূপকথা ও রোমান্সের মাঝামাঝি এক উপসংহারে ঔপন্যাসিক এই নায়িকার সঙ্গে রাজপুত্রের মিলন ঘটান। সবমিলে নায়িকা মৃণালিনী নৃত্যে, গীতে, এমনকি অশ্রুপাতেও বড়ই মনোরম। কিন্তু এ উপন্যাসের কাঠিন্যের পক্ষে এসব অনেকটাই বেমানান। যে সামান্য একটু উপন্যাসের সুর 'মৃণালিনী'তে আছে সেই সুরের পক্ষে মৃণালিনী তাই অনেকটাই বেপর্দার এক চরিত্র।

অন্যদিকে মনোরমা বেসুরো নয়, তবে অস্পষ্ট। তার প্রাথমিক বালিকাসুলভ চপলতা এবং পরিশেষের দৃঢ়তা পুরোপুরি বিশ্লেষিত হয়নি। তবু মনোরমা মৃণালিনীর তুলনায় বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং এই উপন্যাসের নিকটবর্তী মানুষ। গোপাল হালদার মহাশয় মনোরমার মধ্যে স্প্লিট পারসোনালিটিও (split personality) দেখেছেন।[১] এই একটি মাত্র নারী এবং অংশত পশুপতি এখানে উপন্যাসের সুরে বাঁধা চরিত্র। এ দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'মনোরমা'ও হতে পারতো। কারণ মনোরমা ও বঙ্গদেশ উভয়েরই ট্র্যাজিক পতন ঘটলো একই দিনে। ঐ দুর্দিনে মনোরমার স্বামী এবং বঙ্গদেশের রাজা দুজনেই দেশে আছেন কিন্তু সে দুটি মানুষ কেউ গৃহলক্ষ্মী বা দেশলক্ষ্মীর রক্ষার্থে ব্যাপৃত হননি। হতে পারেন নি। ঘটনার এই সাদৃশ্যকে এই উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু দেখা গেল এই তুলনা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং প্রচ্ছন্নই থেকে গেল। মনে হয় বঙ্কিম যেন মনোরমার ইতিহাস-তাড়িত ট্র্যাজেডির তুলনায় মৃণালিনীর নৃত্যগীত কটাক্ষের কাহিনীতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। ইতিহাসের সত্যনির্ধারণ করার উপন্যাসে রোমান্সের জোয়ারই তাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হোল। হয়তো ঐ কারণেই হেমচন্দ্রের চরিত্রেও পরাজয়ের প্রতিশোধগ্রহণ এবং মৃণালিনীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের দ্বন্দ্বটি উপন্যাসোচিত নিপুণতায় গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র সবসময়ই হেমচন্দ্রের প্রণয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শেষপর্যন্ত পূর্ববিবাহের বৃত্তান্ত যোগকরে শেষরক্ষা করেছেন। অথচ 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দু-তিন আঁচড়ে পুরোপুরি মানুষ আঁকতে দেখেছি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা, বীরেন্দ্র সিংহ, আয়েষা খুবই স্বল্পপরিসরে গড়ে তোলা চরিত্র। এক

প্যারাগ্রাফে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষ আঁকতে পারেন তার প্রমাণ বিষবৃক্ষের তারাচরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে এ-রকম উদাহরণ প্রচুর। কিন্তু 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ম্যাজিক নেই। শিল্পী বঙ্কিম এই উপন্যাসে যেন দেখা দেন না। একটি দ্বিধা বা এক অমীমাংসিত মানসিকতার জড়তা যেন উপন্যাসটির পাতার পর পাতায় উন্মোচিত হতে থাকে। সেই জন্য প্রধান দুই নারী চরিত্রই শিল্পের সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। মানুষ আঁকার শ্রেষ্ঠতম এই কারিগরের কাছে এ রকম অসম্পূর্ণতা অকল্পনীয়। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় বড় শিল্পীর এই দুর্বলতার মূল কারণ কি? কেন তিনি রোমান্স ও ট্র্যাজেডি মিলিয়ে লেখার অসম্ভব চেষ্টা করেন? কেন তিনি এমন কর্মে প্রবৃত্ত হন যা কোথাও নিয়ে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না!

এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আছে এই উপন্যাসটির রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে। আছে উপন্যাসের অন্তর্নিহিত স্বাদেশিকতার প্রচ্ছন্ন প্রবাহটির মধ্যেও। লেখক নিজেই বলেছেন—একটি উদ্দেশ্য থেকে এই উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়[১] মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যই এ উপন্যাসরচনা। উদ্দেশ্যটি খুব অনুধাবন করার মতো। বঙ্গদেশে যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি। কিন্তু মুসলমানের প্রথম বঙ্গবিজয় এবং সপ্তদশ অশ্বারোহীর দেশজয় এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার বিষয়। এই বিষয়টিতে যে স্বদেশপ্রীতি আছে তাকে একদিক থেকে মনে করা যেতে পারে হিন্দুর হিন্দুদেশপ্রীতি। তবে এই আলোচনায় আমরা এখন যাবো না। সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ সম্পর্কিত আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টি ভালো করে দেখবার চেষ্টা করবো। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ঐ বিজয়ের একটি নতুন ব্যাখ্যা রেখেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান অনেকটাই সত্যি।[২] তবুও এরকম একটি ঐতিহাসিক বিষয়ে একটি মতপ্রকাশ করার জন্যে যে উপন্যাস পরিকল্পিত হয় তাতে ঔপন্যাসিকের উপর একটি স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি এসেই পড়ে। কারণ উপন্যাসের পরিণতিকে কোনো প্রক্রিয়াতেই তিনি পরিবর্তন করতে পারবেন না। এ অবস্থায় পূর্বনির্ধারিত এই উদ্দেশ্য তার ঔপন্যাসিক কল্পনাশক্তির কিছুটা বিরুদ্ধতাই করেছে। কারণ কোনো একটি বিষয় প্রমাণ করা এবং একই সঙ্গে তাতে রসসঞ্চার করা দু-রকমের কাজ। একসঙ্গে দুটি কাজ করা অসম্ভব নয়, তবে দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ইতিহাসও বেশী আনুকূল্য করেনি। কারণ সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় করুক

বা না করুক বখতিয়ার খিলজী যেভাবেই হোক বঙ্গদেশের অনেকটাই দখল করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক সত্যের বিপক্ষে হেমচন্দ্রের বীরত্ব বা মাধবাচার্যের নিপুণ পরিকল্পনা পরাজিত হতে বাধ্য। তবুও ঐ পরাজয়কে নিয়ে উপন্যাস করা যেত। কিন্তু সে উপন্যাস হোত ট্র্যাজিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরাজয়ের মধ্যেও একটা বিজয়কে দেখানোর প্রত্যাশায়, নিদেনপক্ষে পরাজয়ের উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দেবার বাসনায় এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন।[৪] কিন্তু নবদ্বীপে যেহেতু যুদ্ধ বিশেষ কিছু হয়নি তাই পরাজয়কে সামরিক দিক থেকে মহত্তর করে তুলতে গেলে ইতিহাসবিরোধী কল্পনার বিস্তার করতে হোত। সেজন্যে তিনি পরাজয়কে মহত্তর না করে বরং বঙ্গজয়ের পদ্ধতিকে হীনতর করে তুলেছেন। বখতিয়ারকে মিথ্যাবাদী কুচক্রী ও ভণ্ড করে এঁকেছেন। এবং অন্তিম আশার সঞ্চার করেছেন পশ্চিমদেশীয় বণিক কর্তৃক 'যবন' রাজত্বের অবসানের সম্ভাবনার কথা বলে এবং কামরূপ এবং পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। সে সঙ্গে কৈফিয়ৎস্বরূপ 'যবন' কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের জ্যোতিষবচনও দু'একবার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ পরাজয়ের মধ্যেও একটা অপরাজয়ের রেশ বা আসন্নবিজয়ের সম্ভাবনার কথা বঙ্কিমচন্দ্র রেখে দিতে চেয়েছেন। এরসঙ্গে মুসলমানবিরোধী বীরত্বের এক হাস্যকর রূপায়ণ আছে যখন হেমচন্দ্র নগরমধ্যে একা প্রচুর মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবিজিত থাকেন। অর্থাৎ যে উপন্যাসের স্বাভাবিক প্রবণতা হতে পারতো ট্র্যাজেডির দিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন উল্টোপথে। ইতিহাসের উল্টো দিকে কল্পনাকে নিয়োজিত করার ফলে পদে পদে এখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমন এক পরিবেশ রচিত হয়েছে যেখানে কল্পনার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হবার অবস্থা। এর ফলেই হয়তো এ উপন্যাসের চলন বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের মতো অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ নয়। পদে পদে এখানে আড়ষ্টতা ও ছন্দহীনতা। এ উপন্যাসে কোন চরিত্রও গড়ে উঠলো না এ কারণেই। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস আরও লিখেছেন। 'রাজসিংহ,' 'বিষবৃক্ষ' এবং 'আনন্দমঠ'ও উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনার বীজ আছে। কিন্তু 'মৃণালিনী'র মতো দুর্দশা তাঁর অন্য কোন উপন্যাসের হয়নি।

তবে এই সমস্ত বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের অগোচরে ঘটেছে একথা ভাবাও ভুল হবে। যদি তাই হোত তবে সংস্করণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের

আনুপূর্বিক পরিবর্তন করে ফেলতেন : যা তিনি করেছেন 'রজনী,' 'রাজসিংহ' বা 'সীতারামে'র ক্ষেত্রে। বরং মনে হয় দুর্বল বা সবল যাই হোক 'মৃণালিনী'র ঠিক এরকম হয়ে ওঠার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের যেন কোথাও একটু সায়ও ছিল। হয়তো এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার পরিণাম বহন করেছে। এ কথা আমাদের মনে হয়েছে নিম্নোক্ত কারণে।

সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা জয়ের কাহিনী মিন্‌হাজউদ্দিন বর্ণনা করেছেন এবং ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁর বাংলার ইতিহাসে এই কাহিনী গ্রহণ করেছেন। এই কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

> 'ষষ্টিবৎসর' পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দিন এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য মিথ্যা, তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।'

এই সিংহ ও মানুষের তুলনাটি লক্ষ করার মতো। পরাজিত সিংহের প্রতিবেদনে মানুষ যে 'মূষিকতুল্য' হয়ে পড়তো এই উক্তিটিতেও বিশেষ তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। বঙ্কিমের কাছে সেনরাজত্বের পরাজয় সিংহের পরাজয়ের মতো। অর্থাৎ সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখ্‌তিয়ার খিলজি বঙ্গদেশ জয় করেন মিন্‌হাজউদ্দিনের এই গল্প বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি বাঙালি জাতির শৌর্য্য-বীর্যের প্রতি আস্থা কখনোই হারান নি। ঐ ধরনের জাতীয় কলঙ্কে বিশ্বাস না করতে পেরে তিনি 'মৃণালিনী' রচনায় হাত দেন। ঐতিহাসিকের মিথ্যা কলঙ্ককে তিনি কল্পনার সাহায্যে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন। তবে সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনীটি তিনি উপন্যাসে রেখেছেন। কিন্তু নিজের কলমে নয়, মিন্‌হাজউদ্দিনের কলমে। মিনহাজের বিবরণ অনুবাদ করে তিনি তার পাশে বাঙালির পরাজয়ের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এঁকেছেন। এই কলঙ্কমোচনের উদ্দেশ্যেই এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাইরে থেকে প্রাথমিক ভাবে এ রকমই মনে করা যায়।

অন্যদিকে বাংলার পরাজয়ের স্মৃতি বাঙালি বঙ্কিমের মনকে কতখানি যে পীড়িত করেছে তার পরিচয় এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখেও শুনতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে হেমচন্দ্র মাধবাচার্যকে প্রণাম করে বলছেন—

> 'যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্বে বিধিলিপি। নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড় জয় করিল কি প্রকারে? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, একদিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয় তবে এই ক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।'

মাধবাচার্যের মুখেও শোনা যায় তিনি হেমচন্দ্রকে বলেছেন—

> 'তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত।' (১।১)

বঙ্কিমের যে স্বদেশপ্রীতি পরবর্তীকালে কমলাকান্তের 'একটি গীত'-এ ও 'আনন্দমঠ'-এ রূপায়িত 'মৃণালিনী-তে আমরা তার প্রথম আভাস দেখতে পাই।

বঙ্কিম তাঁর 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে বলেছেন—

> 'যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। (এখানে 'জাতি' শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।) ইহা কাহাকে বলে হিন্দু তাহা জানিত না।'

এই প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর অভিমত বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি বলছেন—

> 'সেকালের হিন্দু রাজপুত্র হেমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের প্রক্ষেপকে পাই, হেমচন্দ্র তৎকালীন মানুষ নয়, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মানস প্রতিক্রিয়া। ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার আতসকাচে ঘনীভূত হয়ে তা দেখা দিয়েছিল একটি প্রজ্বলন্ত শিখা রূপে—হেমচন্দ্র সেই মানসাগ্নির শিখা। হেমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের আচরণে পাই বঙ্কিমচন্দ্রকে ও তাঁর কালের আকাঙ্ক্ষাকে।'[১]

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে হেমচন্দ্রের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর স্বাদেশিকতাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাই না। বস্তুত হেমচন্দ্র প্রণয়ে যত আধুনিক দেশপ্রীতিতে ঠিক ততোটা নয়। বরং তার দেশপ্রেম অনেকটাই ফিউডাল স্বাতন্ত্র্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। তাতে স্বদেশউদ্ধার, থেকে প্রতিশোধ-গ্রহণ ও তুর্কিনিধনের প্রবণতা বেশী। জন্মভূমি কথাটি তিনি সমগ্র উপন্যাসে একবার মাত্র বলেছেন। এ অবস্থায় বঙ্কিমের কালের আকাঙ্ক্ষা হেমচন্দ্রের আচরণে পুরোপুরি ফুটেছে বলা হয়তো ঠিক হবে না। তবে হেমচন্দ্র একেবারে পুরোপুরি মধ্যযুগীয় মানুষও নয়, তারমধ্যে আধুনিক জীবনের বন্ধনমুক্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অল্পবিস্তর মিলেছে।

একদিক থেকে 'আনন্দমঠ' এবং 'মৃণালিনী'র মধ্যে একটা সম্পর্কও আছে। 'মৃণালিনী'তে যে স্বাদেশিকতার সূচনা সেই স্বাদেশিকতার পরিণতি আছে 'আনন্দমঠে'। ভবানন্দের দু একটি উক্তিতে বন্দে মাতরম্ গানে সর্বোপরি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পরিকল্পনাতেও আমরা সেই সম্পর্কের বিস্তার অনুভব করতে পারি। এ ছাড়াও অন্য একটি নৈকট্যও এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে আছে। 'মৃণালিনী'তে এক সন্ন্যাসী 'যবনে'র হাত থেকে বঙ্গদেশ উদ্ধার করার বাসনায় অকৃতকার্য হয়েও জ্যোতিষগণনার মাধ্যমে আশ্বাস পেয়েছিলেন যে পশ্চিম দেশাগত বণিক 'যবনে'র হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আর এক সন্ন্যাসী ঐ পশ্চিমাগত বণিকের কাছে দেশকে রেখে হিমালয়ে যাত্রা করেছেন। অর্থাৎ 'মৃণালিনী' এবং 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার ঘটনাগত দিক থেকে পরস্পরের পরিপূরক। 'মৃণালিনী'র মাধবাচার্যের প্রত্যাশা আনন্দমঠে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই সমস্ত নানা প্রসঙ্গে খণ্ড খণ্ড ভাবে মৃণালিনী উপন্যাসের সঙ্গে আমরা বঙ্কিমমানসের নানা প্রান্তকে জুড়ে দেখতে পারি। বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে এই উপন্যাসের নৈকট্যের কথা। কিন্তু কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থেকে এই উপন্যাসের রচনা তা অনুধাবন করতে হলে নিম্নোক্ত দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

লক্ষণীয় যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাদেশিকতার কথা 'মৃণালিনী'তে একবারও নেই। মাধবাচার্যের লক্ষ্য দেশ থেকে মুসলমান বিতাড়ণ। হেমচন্দ্রের লক্ষ্য এক পূর্বতন পরাজয়ের প্রতিশোধগ্রহণ। যদিও হেমচন্দ্র একবার মাত্র 'জন্মভূমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তবু এ দুজনের কাছেই দেশ বলে কোন

বিষয় নেই। মাধবাচার্যের রক্ষণীয় বিষয় ধর্ম। হেমচন্দ্রের রক্ষণীয় কিছু নেই তবে তার কাঙ্খিত বস্তু যুদ্ধজয়। এর মাঝখানে অনেকটাই স্বজাতীয়তা আছে কিন্তু স্বাদেশিকতা খুব প্রত্যক্ষভাবে নেই।

একটু গভীরভাবে ভাবতে বসলে মনে হয় এই না থাকাটাই এক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ঐ সময়টি হচ্ছে স্বাদেশিকতার স্বাভাবিক বিকাশের সময়। এই উপন্যাসের এক দশক আগে মধুসূদন রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রামকাহিনীর নবরূপায়ণেও স্বাদেশিকতা খুবই স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে আমরা দেখেছি। মেঘনাদবধের মতো করে না হলেও 'মৃণালিনী'তেও একটি নগরবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সে সূত্রে স্বাদেশিকতা বা দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ অন্তত একটি পার্শ্বচরিত্রের মারফতেও উপন্যাসে অঙ্কিত হতে পারতো। কিন্তু তুর্কীদের এই বঙ্গবিজয়ের কাহিনীতে আমরা দেশপ্রেমিক ছাড়া সব রকম চরিত্রই পাই। প্রশ্ন জাগে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এরকম ঘটনা ঘটতে দিলেন কেন?

এর একটা তাত্ত্বিক কারণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আমরা দেখিয়েছি যে স্বাদেশিকতা সমস্ত পৃথিবী জুড়েই একটা নির্দিষ্ট সময়ে জন্মলাভ করেছে, একথা খুবই সম্ভব যে চিন্তাবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদেশিকতার উত্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।[১] এই বোধটির জন্মকাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সে দিক্ থেকে মনে করা যেতে পারে যে এই মধ্যযুগের ঘটনায় ফরাসী বিপ্লবোত্তর স্বাদেশিকতার রূপায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র খুব সঙ্গত কারণেই সমুচিত বলে মনে করেন নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি অন্য বিষয়ও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। খুবই সামান্য পরিসরে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা, অমাত্যবর্গ এবং স্তাবকবৃন্দের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে আলস্য, চাতুর্য ও মিথ্যাচারের যে স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তাতে সেযুগে নবদ্বীপে একজন দেশপ্রেমিক মানুষও যে ছিলেন না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদকে লক্ষ করে মাধবাচার্য বলেছিলেন—

> 'মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।'

এই উক্তি সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর সমস্ত নবদ্বীপবাসীর প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্রের ধিক্কার। সে সঙ্গে রাজসভায় লক্ষ্মণ সেনের মুখে আমরা

একটি অদ্ভুত কথা শুনি। তুর্কি সৈন্য নগরবিজয়ার্থে আসছে, একথা শুনে রাজা বলেছেন—

'আমি কি করিব—আমি কি করিব ? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুর্কীরা আসুক।'

এই বিলাপ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এই রাজ চরিত্রে আর যাই থাকুক দেশপ্রেমের কণামাত্র নেই। এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝি বঙ্কিমচন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কেন অনাস্থা পোষণ করতেন। কেন পরবর্তীকালে তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছিল অনুশীলন তত্ত্ব। কেন যে ধর্ম সংসারের ও স্বদেশের প্রয়োজনে লাগে না তা বঙ্কিমের কাছে শেষপর্যন্ত গ্রহণীয় হয়নি। কেন তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ সংসারত্যাগী মানুষদের বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেননি। একই কারণে ঐ সমাজবিমুখ, আত্মমুখী ও নিজের মুক্তির জন্যে লালায়িত রাজাকেও বঙ্কিমচন্দ্র ধিক্কার জানিয়েছেন। এ উপন্যাসের নবদ্বীপ শক্তিহীন ও অন্ধকার, কারণ আচারসর্বস্ব এক নিষ্ফল ধর্মাচরণে সে আবদ্ধ।

এ সিদ্ধান্তের পরেও এ ক্ষেত্রেঅন্য একটি প্রশ্ন থাকে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় সপ্তদশ অশ্বারোহীর বিজয় কাহিনীর প্রতিবাদে নবদ্বীপে দু-পাঁচজন বীর-পুরুষের উপস্থিতিও নেই কেন ? কেন ঐ অন্ধকার ? উপন্যাসে বঙ্কিম বহুক্ষেত্রে এর থেকে বেশি ইতিহাসলঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু এখানে বাঙালির জড়তা, মূর্খতা ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভীরুতার আড়ালে কণামাত্র দেশপ্রেম বা দেশরক্ষার বাসনা কেন লেখকের লক্ষগোচর হয় না ? এর পেছনে অন্য কোনো হেতু কি আছে ? কেন তিনি এমন একটা দেশের কথা বলেছেন যে দেশটাকে কেউ ভালোবাসে না ! যার বিপদে কেউ দাঁড়ায় না ! 'মৃণালিনী'তে কেন এমন একটি অদ্ভুত দেশের কথা আমাদের পড়তে হয় যে দেশে প্রজা আছে, সৈন্যসামন্ত, রাজা, অমাত্য, সব আছেন, অদূরেই আছে পররাজ্য-আক্রমণকারী মানুষরা, কিন্তু দেশপ্রেম নেই। কেন এই ভয়াল পরিবেশ !

এই প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাবো এই উপন্যাসের শেষে এদেশের ভয়ংকর পরিণতিও বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। নবদ্বীপের পথে পথে তুর্কী সৈন্যের হত্যালীলা, ধর্মান্তরীকরণ, লুঠ ও অত্যাচারের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে বলেছেন। যে দেশে দেশপ্রেমিক নেই সে দেশের পরিণতি

কি ওরকমই হয় ? হয়তো তাই। নইলে ঐ রকম সুদীর্ঘ হত্যা ও অত্যাচারের বর্ণনার অন্য কোন হেতু নেই। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমহীনতার নির্মম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ উপন্যাসে দেশপ্রেমের দিকে পরোক্ষে তর্জনীসংকেত করেছেন। এ উপন্যাসে তাই বোধকরি স্বাদেশিকতা না থাকার মধ্যেই ঔপন্যাসিকের স্বদেশচিন্তার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে আছে। অন্ধকার থেকে এ উপন্যাস হয়তো আলোর দিকে পথনির্দেশ করে। স্বদেশবিমুখতা থেকে পাঠককে স্বদেশপ্রেমের দিকে উদ্‌বুদ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র বোধকরি বিষয়টি এরকম করেই ভেবেছিলেন।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)

বাইরের অর্থে স্বাদেশিকতা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নেই। স্বদেশকে সামনে রেখে এ উপন্যাস রচিতও হয়নি। এ উপন্যাসের বিষয় এবং লক্ষ্য বোধকরি তৎকালীন সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষ বাক্যটিতে 'গৃহে গৃহে অমৃত ফল' ফলাবার কথা বলে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছেন। নগেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, সূর্যমুখী ও কমলমণি সেকালীন বঙ্গসমাজের সর্বস্তরের প্রতিভূ নন। এরা বঙ্গসমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। সেদিক থেকে মনে হয় এ উপন্যাসের বিবেচ্য ছিল নববঙ্গের কিছু পরিবারের কতিপয় মানুষ। তাদের পেছনে সে যুগের সমাজও প্রচ্ছন্নভাবে এ উপন্যাসে দু-একটি ক্ষেত্রে তার পরিচয় উৎকীর্ণ করেছে। কিন্তু বৃহত্তর দেশ এ উপন্যাসের পরিধির অনেক বাইরে। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু সত্যি মনে হয়।

আমরা জানি ব্যক্তি ও দেশের, এমনকি দেশ ও পরিবারেরও কিছু সমস্যায় একরকমের অন্তর্লীন যোগাযোগ থাকে। তবে সে যোগাযোগ সর্বব্যাপ্ত নয়। সমাজের বা পরিবারের অন্তর্লীন জোয়ার ভাটা বা টানাপোড়েনের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের যোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরবর্তীও হতে পারে। এ উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ে নগেন্দ্র ও কুন্দ ক্ষতবিক্ষত হয়, হীরা ও দেবেন্দ্র যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভোগে, সর্বোপরি বিষবৃক্ষের পরিণাম দেখিয়ে লেখক সমাজে যে বিষমুক্ত ফসল ফলাতে চান তার সঙ্গে মধ্যউনবিংশশতাব্দীর স্বদেশচিন্তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ধারণ করা একদিক থেকে কিছুটা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবুও এ উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় এ প্রসঙ্গে অন্তদিকও উন্মোচিত হতে পারে।

পরাধীন দেশের স্বাদেশিকতা এবং স্বাধীন দেশের স্বাদেশিকতার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। পরাধীন দেশের স্বাদেশিকতার মধ্যে অনেকটাই পরাধীনতা থেকে মুক্তির বিষয় অন্তর্ন্যস্ত থাকে। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাদেশিকতায় বেশি থাকে দেশগঠনের ধারণাসমূহ। তবে এই সীমা তেমন অনড় নয়। এই গণ্ডি লঙ্ঘিত হতেই পারে। যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে। পরাধীন দেশে থেকেও দুজনেরই স্বাদেশিকতায় দেশ-গঠনের চিন্তাভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু এই ব্যতিক্রম সত্বেও এই সূত্রটি বোধকরি চলনসই একটা ধারণা। পরাধীন দেশের স্বাদেশিকতার মূল সুর বন্ধনমুক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে, স্বাধীন দেশে স্বাদেশিকতা গড়ে ওঠে দেশগঠনকে কেন্দ্র করে। বিষবৃক্ষে পরাধীনতার বিমোচন কখনও প্রাধান্য লাভ করেনি। ইংরেজ যে আমাদের দেশশাসন করছে পরাধীনতার একটি দুর্বহ যাতনা যে দেশ বহন করে চলেছে সে সংবাদ বিষবৃক্ষ থেকে বের করা অসম্ভব। অথচ এ উপন্যাস তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে পরম সমাদরে গৃহীত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা'য় 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের দিনগুলোর একটি ছবি এঁকেছেন।[৮] সে ছবি থেকে আমরা বুঝতে পারি বঙ্গদেশের এই প্রথম সার্থক ও রসোত্তীর্ণ সামাজিক উপন্যাস বাঙালি সমাজে কি বিচিত্র ক্রিয়া করছিল এবং কি পরম সমাদরে ও আগ্রহে এ উপন্যাস সমাজে গৃহীত ও পঠিত হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের শেষে লিখেছেন—

'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' অর্থাৎ এই উপন্যাসের লক্ষ্য সমাজগঠন। উপন্যাসের লক্ষ্য মানুষের ঘরের শান্তি। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য রচনায় আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদনে তিনি বলেছেন—

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'

এই নির্দেশ, বিশেষ করে নির্দেশের প্রথম অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও মেনে চলতেন। অর্থাৎ দেশহিত এবং লোকহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মূল লক্ষ্য। এদিক থেকে বিষবৃক্ষ উপন্যাসেও দেশহিতের একটি গঠনমূলক ধারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি পাই। সমাজের মঙ্গল কোন্ দিকে,

সামাজিক ন্যায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বেচ্ছাচার, অনিয়ন্ত্রিত রূপমোহ ও লোভের পরিণাম কি, বিশেষ করে নারীদের মুক্তির বিষয়টি কোন্ পথে ভাবা প্রয়োজন এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এ উপন্যাসে আমরা প্রথম পেলাম। এ সব বিষয় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। একাধিক উপন্যাসেও এ সব প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু এই উপন্যাসেই প্রথম বঙ্কিম কি সমাজ গড়তে চান তার অবয়ব বোঝা গেল।

এছাড়াও দু-একটি অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে সেযুগের সমাজজীবনও এ উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তারাচরণ চরিত্রটি। তারাচরণ ইংরেজি পড়েছে, সে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। সে বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও পৌত্তলিকতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখে। এই মানুষটি আমাদের সামনে উনবিংশ শতাব্দীর একটি আন্দোলনের প্রতিভূ। সে আন্দোলনকে লেখক এ উপন্যাসে কি দৃষ্টিতে দেখাতে চান তার একটি পরিচয় আমরা তারাচরণের রূপায়ণ থেকে পাই। এ উপন্যাসে আমরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর চরিত্রের অন্ধকার দিকটিও দেখেছি। দেবেন্দ্রচরিত্রে কোন ভদ্রজনোচিত গুণ নেই। ব্রাহ্ম তারাচরণও যখন প্রায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাসে আবির্ভূত হয়, যখন সে বক্তৃতায় 'খুড়ি জ্যেঠাই'-এর বিয়ের কথা বলে, অন্যের রচনা আত্মসাৎ করে বা পণ্ডিতকে দিয়ে লিখিয়ে প্রবন্ধ লেখে এবং নারীমুক্তির ক্ষেত্রে স্ববিরোধী আচরণ করে তখন এই একপেশে মূল্যায়ন দেখে বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিপক্ষ হিসেবে কদাচিৎ যে বঙ্কিমন্দ্রকে আমরা দেখেছি তার একটা অস্পষ্ট অবয়ব যেন পাই। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি প্রশ্নেরও আমরা এই প্রথম সম্মুখীন হই। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতির ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডের অন্ধকার দিকটিই কেন বেশি দেখেন। যে সমাজে অমৃত ফলানোর জন্যে এই উপন্যাস রচিত হোল তার অন্য সংস্কারকের অনুগামীরা কেন সব সময়েই দুশ্চরিত্র বা দুর্বল মানুষ হবেন! কেন তাঁরা সবসময়েই স্ববিরোধীতায় আক্রান্ত হবেন! শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পেছনেও একটি ছায়া দেখেছিলেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ বিশ্লেষণের মধ্যেও কি একটি ছায়ার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল? নাকি এসবই উপন্যাসের অঙ্গ মাত্র। এই প্রশ্নের উত্তর এখানে পাওয়া যায় না।

বস্তুত স্বদেশ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন গঠনমূলক চিন্তা করতে বসেন, যখন বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, নতুন ধর্মের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

সমকালীন অন্যান্য চিন্তাবিদদের সঙ্গে মতযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, যখন কুন্দনন্দিনীর পর রোহিণী আবার এক আরোপিত ধ্বংসের মুখোমুখি হয় তখন আপাতনিষ্ঠুর একজন দৃঢ় মানুষের আমরা সম্মুখীন হই। এই মানুষটির শ্রেষ্ঠতম নারীচরিত্রটি তাঁর হাতেই খুন হয় 'ঘরে ঘরে অমৃতফল' ফলানোর জন্যে। অথচ ইনি এ দেশের এক শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক! এই উপন্যাস রচনা করতে করতেই ইনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের জন্যে 'বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন' হতেও দ্বিধাবোধ করেন না। অন্যদিকে আবার বিদ্যাসাগরের অভিমতও দু-এক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে প্রবলভাবে বর্জনীয়। তাঁর এই স্বরচিত প্রেম ও ঘৃণার সীমা তাঁর উদ্দিষ্ট সমাজ-গঠনের জন্যে পারিবারিক নীতিবোধের এই নিষ্ঠুর মান; তাঁর সাহস, অনুভূতির ঐ তীক্ষ্ণতা সব কিছু মিলে আমরা দেশগঠনে নিয়োজিত বঙ্কিমচন্দ্রকে যেন 'বিষবৃক্ষ' থেকেই অনুভব করতে পারি। বুঝতে পারি এই মানুষটি দেশগঠনের জন্যে চূড়ান্তরকমের আত্মনিগ্রহেও প্রস্তুত। স্বদেশ ও সমাজের জন্যে তিক্ততম পাচনও তিনি দ্বিধাহীনভাবে গলাধঃকরণ করতে এবং করাতেও পারেন। এবং নিজের ধারণা নিয়ে তিনি একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন কোনো এক বান্ধবহীন প্রান্তেও।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে এভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদের একটা সার্থক সূচনা আমরা দেখতে পাই। কুন্দনন্দিনী, হীরা, দেবেন্দ্র ও তারিণীচরণকে লক্ষ করে আমরা অনুভব করে নিতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা কোন্ পথে প্রবাহিত হচ্ছে। এই চিন্তার ক্রমবিকাশের স্বরটি পরিপূর্ণ পরিচয় পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনে লেখা প্রবন্ধাবলী পর্যন্ত। এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবত তাঁর প্রবন্ধের আলোচনাতেই বেশি করে উন্মোচিত হবে। যেখানে তিনি অনুশীলন ধর্মের রচনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবন, দেশপ্রেম, লোকহিত প্রভৃতি বিষয়কে মিশিয়েছেন।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মতো 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশপ্রেমের কোন প্রসঙ্গ নেই। 'চন্দ্রশেখর' রচিত হয় 'বিষবৃক্ষে'র ঠিক পরেই (১৮৭৫),

১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে কর্মরত ছিলেন। অনুমান করি সে সময়ে তিনি নবাবী আমলের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন। তার সঙ্গে বিষবৃক্ষের অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগের রেশও তখনো বঙ্কিমচিত্তকে অধিকার করে রেখেছিল। এই সব বিষয় সম্মিলিত হবার ফলেই মীরকাসেমের পরাজয়ের বৃত্তান্তের সঙ্গে শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখর এই ত্রিভুজ প্রেমের সংযোগস্থাপনা হয়েছে বলে মনে হয়।

তবুও এই উপন্যাসে এক অর্থে 'বিষবৃক্ষ' থেকে স্বদেশসম্পর্কিত বিষয় কিছু অধিক মাত্রাতেই আছে। কারণ প্রতাপ, মীরকাসেম এবং গুর্‌গণ খাঁ তিনজনেই এই উপন্যাসে কখনো না কখনো ইংরেজবিতারণে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে সেই চেষ্টার পেছনে বিন্দুমাত্র স্বদেশপ্রীতি ছিল না। ইংরেজ লরেন্স ফষ্টর যেহেতু চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর জীবনের বিপর্যয়ের সূচনা করেছেন সেইজন্যে প্রতাপের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রোধ। তেমনি মীরকাসেমের মুখ্য উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যউদ্ধার। এই উদ্দেশ্য অন্যান্য মধ্যযুগের রাজাদের রাজ্যরক্ষার আকাঙ্ক্ষার মতোই। স্বদেশপ্রীতির উষ্ণতা এই রাজ্য-উদ্ধার বাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অন্যদিকে গুর্‌গণ খাঁ রীতিমত একজন পেশাদার এবং কুচক্রী সেনাপতি। সে চায় মীরকাসেমের রাজ্য। ইংরেজ বিতাড়িত না হলে সেই বাসনা পূর্ণ হবে না বলেই গুর্‌গণ ইংরেজ বিরোধী। এই সমস্ত হেতুতে বঙ্গদেশ যখন তাঁর শেষ স্বাধীন সম্রাটকে হারাচ্ছে সেই সময়ের বৃত্তান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই উপন্যাস স্বদেশ-প্রেমমূলক উপন্যাস নয়। লেখক চাইলে এই কাহিনীতে হয়তো ইংরেজ বনাম বঙ্গদেশের শেষ সম্রাটের ইতিবৃত্তটিকে সমীপবর্তী রেখে দেশপ্রেমের উষ্ণতা যোগ করতে পারতেন কিন্তু লেখক তা করেন নি। মীরকাসেম এই উপন্যাসের একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। তার রাজ্য হারানোর হাহাকার এই উপন্যাসের পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করবার কোনো চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করেননি। বরং মীরকাসেমের পরাজয়ের থেকে একই দিনে প্রতাপের প্রাণত্যাগের ঘটনাতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি আলোড়িত হয়েছিলেন। তাই প্রতাপ শৈবলিনী এবং চন্দ্রশেখরের ত্রিকোণ বৃত্তান্তই এই উপন্যাসের মূল বিষয় এক অর্থে শৈবলিনী বৃত্তান্ত একটু নতুন চেহারায় আর একটি 'বিষবৃক্ষ'। এখানেও ঘরে-ঘরে অমৃতফল ফলানোর বাসনায় এমনকি রাষ্ট্রীয় ঘূর্ণিকেও

নিষ্প্রভ করে শৈবলিনীর নরকযন্ত্রণার দীর্ঘ বর্ণনা মুখ্যস্থান অধিকার করে রয়েছে।

তবে একজন ঔপন্যাসিক এইভাবে তাঁর বিষয় বেছে নিতেই পারেন। বিশেষ করে যে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যরচনায় বিশ্বাস করেন না তাঁর পক্ষে এ রকমই স্বাভাবিক। কিন্তু এর একটি অন্যদিকও আছে। দেশপ্রেম যে লেখকের মনোজগতের প্রধানতম ঝোঁক, বাঙালির বাহুবল এবং বঙ্গভূমির বীরত্ব নিয়ে যিনি একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন, যিনি ধর্মতত্বে স্বদেশপ্রীতিকে শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম বলেন, তাঁর কলমে ইতিহাসের ঐ সন্ধিক্ষণে শুধুমাত্র রূপমোহের পরিণাম কি করে একটি উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে ওঠে সে কথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়। তবে কি জীবনের এই স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির পারিবারিক জীবনের মনোগামিকেই স্বদেশজিজ্ঞাসা কিম্বা দেশপ্রেমের অধিক কাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে মনে করেছিলেন। নাকি ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণকে সেই স্থান দিয়েছেন ? নইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লেখকের হাতে ইতিহাস কি করে এ রকম ধূসর ও নিষ্প্রাণ হয় ? অন্ততপক্ষে ইংরেজপক্ষের নির্মম ও স্বার্থান্ধ কুটিলতাসমূহ কেন তাঁর এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয় না। অন্যদিকে ষষ্ঠ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে 'দয়ালু' ও 'ন্যায়নিষ্ঠ' সাম্রাজ্য সংস্থাপক বলে কেন আমাদের পড়তে হয় !

এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হলে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি আমাদের যে পরিমাণে নিরাশ করে এই উপন্যাসের অন্য একটি দিক আমাদের প্রায় সে পরিমাণেই আশান্বিতও করে। ধর্মতত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

> 'যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়' (আত্মপ্রীতি)।

মূলত বঙ্গদেশে লোকহিত সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম যুগের এক প্রধান প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশপ্রীতি ও লোকহিতকে তিনি ধর্মাচরণের সর্বোচ্চ ধাপ বলেও মনে করেছেন। এই ব্যাখ্যান ও প্রচারের কারণ দুর্বোধ্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশানুরাগ ও লোকহিতের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপকতর বিস্তার হোক।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আমরা প্রথম এই লোকহিতের প্রসঙ্গ পাই। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর অপহরণে কাতর চন্দ্রশেখরকে

রমানন্দ স্বামী 'ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্তন' করে বললেন 'যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে'। উপন্যাসটির এ এক বিশেষ মাত্রা। এই একই কথা রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আবারও বলেছেন উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। সেখানে পথে পরিত্যক্ত দলনী বেগমকে সাহায্য করার জন্যে চন্দ্রশেখরকে রমানন্দ বলেন—

'তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ অদ্য হইতে তাহার কার্য কর।' বলে রাখা ভালো দলনী বেগমের দৃষ্টান্ত থাকলেও চন্দ্রশেখরের এই পরহিতব্রত অনেকটাই তার দাম্পত্য-পরহিত। দেশ ও সমাজ নামের 'পর' যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত সেই 'পর'-এর হিতপ্রচেষ্টা এই পরহিতব্রতে বিশেষ নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সামাজিক প্রবন্ধে লিখেছেন—'যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই ধর্ম ; আর যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ তাহাই অধর্ম' (কর্তব্য নির্ণয়-সূত্রের প্রয়োগ)। বলাবাহুল্য অধিক পরিমাণ লোকের হিতপ্রচেষ্টা না থাকলেও চন্দ্রশেখর এবং রামানন্দস্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা এখানে দলনী বেগম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সেদিক থেকে এই পরহিত কিঞ্চিৎ উদারতর বটেই।

এভাবে এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকপ্রীতির একটি অনুরাগস্নিগ্ধ পরিচয় আমরা পাই। সে সূত্রে সম্ভবত একথাও বুঝতে পারি যে দেশানুরাগের সাক্ষ্য না থাকলেও পরহিত প্রসঙ্গ কোনো না কোনোভাবে বঙ্কিমের রচনায় থাকেই। সে সমাজ পরিশোধনের আকাঙ্ক্ষাতেই হোক বা লোকহিতের জয়গানেই হোক। থাকবেই। লোকহিতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে কোনো বড় সৃজনকর্মে আত্মনিয়োগ করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভবই ছিল। এই কথা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো।

তৃতীয় অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. 'মনোরমা শুধু দ্বৈতসত্তার (স্পিলট্ পার্স'নালিটি) আভাস নয়—বিমলা, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবির মতোই মনোরমা নারীরূপ ও নারীসত্তার সম্বন্ধে রেনেসাঁস উন্মেষিত দৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রমাণ'—দ্র-বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ—গোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, ভূমিকা, পৃ-১৭।

২. বস্তুত বঙ্গবিজয় নয়, নবদ্বীপজয়। তাছাড়া নবদ্বীপ তখন লক্ষ্মণ সেনের রাজধানীও ছিল না। সেখানে কোন রাজপুরীও ছিল না।

৩. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেছেন ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাঁশের তৈরী একটি কাঁচা বাড়ীতে হয়তো বাস করছিলেন। তাছাড়া নবদ্বীপের কাছাকাছি বামুনপুকুরে সম্প্রতি খনন করে (বল্লাল ঢিপি) সেন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। লেখিকা সেই ঢিপি নিজে দেখে এসেছেন।

৪. প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের লেখাতেও আমাদের এই ধারণার সমর্থন পাচ্ছি। যেমন অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয় লিখেছেন—বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়ের পর থেকে (মাত্র সতেরোটি অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে গৌড় দখলের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিনই বিশ্বাস করেননি) ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই কাল-সীমার মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন বারবার লিপিবদ্ধ করেছেন তার অবক্ষয়, অধঃপতন এবং পুনরুজ্জীবনের কাহিনী—দ্র-ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ-১৯।

৫. অন্য এক সূত্রে পাচ্ছি ৫০ বছর। দ্র- বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ-৫৩৪। 'দুই প্রাচীন সৈন্যের মুখে বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস শুনে ৫০ বছর পরে মিন হাজ উদ্-দীন, এ কাহিনী লিখেছিলেন।'

৬. বঙ্কিম-সরণী—প্রমথনাথ বিশী, পৃ-৮৬।

৭. এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণায় আমরা কিছুটা অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছি। এ বিষয়ে 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধের সূত্রে কিছুটা আলোচনা করেছি।

৮. 'তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারও ঘুম থাকত না...' দ্র-'ছেলেবেলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ অধ্যায়

উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা: দ্বিতীয় পর্ব

বঙ্কিমচন্দ্র ও আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সব থেকে বিখ্যাত উপন্যাস নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। 'আনন্দমঠ'-এর শিল্পমূল্য নিয়ে সংশয় ও মতান্তর থাকলেও এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এবং আমাদের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে তার গানের ও ভাবের সক্রিয় ভূমিকা আজও এই উপন্যাসের খ্যাতিকে অমলিন করে রেখেছে।[১]

বস্তুত শিল্পগুণে সাহিত্য যুগোত্তীর্ণ হয় একথা সর্বজনবিদিত। কালিদাসের মেঘদূতম্ বা জয়দেবের গীতগোবিন্দের যুগ পেরোনোর শক্তি সম্ভবত তাদের শৈলীতে। বিষয় থেকে বেশি তাদের বিষয়ের শিল্পায়নের জাদুতে। আনন্দমঠে সে জাদু একেবারেই নেই তা নয়। আছে। তবে 'বিষবৃক্ষ' বা 'রজনী'র সার্থকতার মাত্রায় তা পৌঁছোয় নি। এই উপন্যাস যে বৈশিষ্ট্যে শতবর্ষ পেরিয়ে আজও আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবলভাবে আলোচিত, এমনকি ব্যবহৃতও হচ্ছে তার কারণ আছে অন্যত্র। সে কারণ এই উপন্যাসের দেশপ্রেম সঞ্চারনার দক্ষতায়। 'আনন্দমঠ' যদি কল্যাণী ও শান্তির দুর্ভিক্ষতাড়িত দাম্পত্যের সার্থক কাহিনী হোত তবে তার খ্যাতি এবং সাহিত্যমূল্য হয়তো 'রজনী'র মতো হতেও পারতো। বাংলা দেশের পাঠককুলের মধ্যেই তার শ্রদ্ধার আসনও নির্দিষ্ট থাকতো। কিন্তু ভারতবর্ষব্যাপ্ত এই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর অর্জন করা দুঃসাধ্য হোত। এই উপন্যাসটির স্বাদেশিকতার তাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। মূল্য তো আছেই।

তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি আলোচনা করার আগে কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। যদিও এই উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রেরা ইতিহাস থেকে তুলে নেওয়া নয়, কিন্তু এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার মূল্যবান প্রতিফলন হয়েছে।

'আনন্দমঠ'[২]-এ বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা বলেছেন। তবে শুধু মাত্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এই উপন্যাসের প্রেরণা কিনা তা নিয়ে মতান্তর আছে।

কোন কোন সমালোচক বলেন ইলবার্ট বিলের[৩] কথা। কিন্তু তাতে ভারতীয়রা বিশেষ উত্তেজিত হলেও এবং তার ফলে নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনীর সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য বা যোগাযোগ নেই। তাছাড়া 'ইলবার্ট বিল' বড় লাটের আইনসভায় উত্থাপিত হয় ৩০শে জানুয়ারী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। আর 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং 'ইলবার্ট বিলে'র অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে 'আনন্দমঠ' রচিত হয়েছিল—এ অসম্ভব কথা।

'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র সংযোজিত গ্লেইগ ও হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে হান্টার (১৮৪০--১৯০০ খ্রীঃ) সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা ছিল 'আইন অমান্যকারী একদল ডাকাত ('A set of lawless banditti') যারা 'ধার্মিক তীর্থযাত্রীর বেশে বাংলাদেশের প্রধান অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াত এবং যেখানেই যেত সেখানে ভিক্ষা, চুরি এবং লুটপাট করে বেড়াত।' এদের কাজই ছিল 'begging, stealing and plundering wherever they go and as it best suits their convenience to practise.'[৪]

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫ গভর্নর জেনারেল) সন্ন্যাসীদের বলেছেন, 'gipsies of Hindostan' কোথাও তাদের বলেছেন 'desperate adventuress'[৫] তাঁর মতে এই সন্ন্যাসীরা ছিল একদল তীর্থযাত্রী, তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াত। তাদের ঘরবাড়ি, পরিবার কিছুই ছিল না। তারা খুব উৎসাহী, কর্মঠ ও সাহসী ছিল। গ্রামের লোকেরা তাদের খুব শ্রদ্ধা করতো। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত মুসলমান ফকিরেরাও কখনও কখনও একত্রিত হয়ে একই উদ্দেশ্যে কোম্পানীর ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।[৬]

পরবর্তীকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—

> 'হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকির, দুইদলের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। ক্ষুধার্ত কৃষক, সম্পত্তিচ্যুত জমিদার ও কর্মচ্যুত সৈনিকরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই আন্দোলন আরও জোরদার করে তুলেছিল।'[৭]

এছাড়া সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :—

'আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে 'আনন্দমঠে'র ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।'

'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম লিখলেন, 'এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।' এই কথা লিখে বঙ্কিমচন্দ্র দুই সাহেবের" লেখা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কিত উক্তি তুলে দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীদের নানা গুণের অবতারণা করেছেন। সন্ন্যাসীরা সে বর্ণনায় অনেকেই জিতেন্দ্রিয়। তারা বিশেষ ধরনের বৈষ্ণব। তাদের যুদ্ধরীতি, নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক, সেকালের দুর্ভিক্ষ; সন্ন্যাসীদের আহার-আচরণ, আদর্শবাদ, ইত্যাদি সবই উপন্যাসে পরিচ্ছন্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে। শুধুমাত্র হান্টারের রিপোর্ট থেকে এসব পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কোনো সত্যিকারের ঐতিহাসিক সূত্র থেকেও তা পুরোপুরি পাননি। এ মন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যদুনাথ ও রমেশচন্দ্রের বক্তব্য উদ্ধার করে আমরা কিঞ্চিৎ পরেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। তাতে পরিষ্কার হবে সন্ন্যাসীদের ঐ ধরণের সব বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র কতটা বাইরে থেকে পেয়েছেন কতটা নিজেই কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এবার প্রশ্ন এই সব জিতেন্দ্রিয়—স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগকারী—স্বদেশের জন্য প্রাণ-উৎসর্গে দ্বিধাহীন—মাতৃভূমির বন্ধনে নিত্য ক্রন্দনশীল—সন্ন্যাসীর সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় পেলেন! এর কতটুকু আহরিত আর কতটুকু স্বকপোলকল্পিত! আমরা প্রথমে সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে যদুনাথ ও রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ দেখে নিয়ে পরে সে প্রসঙ্গে যেতে চাই।

সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার মহাশয় বলছেন—

'প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ; তাহার (আনন্দমঠের) 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যে সব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম

নহে) ঐ সব অত্যাচার করে, তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব আর আসল "সন্ন্যাসী"রা ছিল শৈব,……'

'সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোদ্ধা সুবায় জমিদারিও করিত ; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশামাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।'…[৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান চন্দ্রনাথ বসুর রিপোর্টও আচার্য সরকারের মতকেই সমর্থন করে।[১০] এ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার আরও লিখছেন—

'ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা। পলাশীর যুদ্ধের দুইশত বৎসর আগে হইতে দিল্লীর বাদশাহদের প্রবল শক্তির সময়ে ভূভারত জুড়িয়া অতি সুন্দর শাসন প্রণালী, শান্তি (ঠিক Pax Britannica-র পূর্বাভাষ) এবং সভ্যতা বিকশিত হয়……
আবার ইংরেজী আমল দৃঢ়বদ্ধ হইবার পর আমরা এই দাগগুলি ততোধিক পরিমাণে পাইতেছি। কিন্তু যখন মুঘল শাসন ও সভ্যতার অৰ্দ্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ ব্রিটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্যশাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা আদায় ছাড়া বাঙ্গালায় কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেষ্টিংস কর্তৃক শাসন সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত বাঙ্গালার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব লেখকই[১১] স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।'[১২]

তাই 'আনন্দমঠে'র ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করে বিভিন্ন সমালোচকদের মন্তব্য দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সামান্য কিছু তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এমন একটি যুগান্তকারী দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তবে অন্যত্র এমন ঘটনার

সন্ধান পাওয়া যায় যার সঙ্গে, 'আনন্দমঠে'র কাহিনীগত এবং আদর্শগত একটা মিল পাওয়া যায়। যার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লেখার আদর্শগত প্রেরণা পেতে পারেন বলে মনে হয়। এ রকম একটি সেকালীন দৃষ্টান্তের নায়ক মহারাষ্ট্রের বীর বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে। তাঁর সারা জীবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। যা আনন্দমঠের সন্তানদলেরও বাসনা ছিল। এখন আলোচনা করে দেখা যাক্, বাসুদেবের বিপ্লবী জীবন বঙ্কিমচন্দ্রকে কতখানি অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিল।

বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কারনালা অঞ্চলের ভূস্বামী ছিলেন তাঁর পিতামহ অনন্তরাও। ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮ সালে তাঁকে কারনালা দুর্গ ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে উপরন্তু তাদের সঙ্গে তিনদিন যুদ্ধ করে বাধ্য হয়ে তিনি পরাজয় বরণ করে নেন। তাই স্বভাবতই পৌত্র বাসুদেব যে ইংরেজ বিদ্বেষ পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে এ সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয় না।[১৩]

বাসুদেব চাকরি করতেন পুনায় মিলিটারী একাউণ্টস্ দপ্তরে। মায়ের মৃত্যুশয্যায় ছুটি না মঞ্জুর হওয়াতে তিনি মর্মাহত হন এবং চাকরির মোহ তাঁর কেটে যায়। এমনিতেও মানসিক শান্তিলাভের আশায় তিনি প্রচুর শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতেন এবং সাধু সঙ্গের চেষ্টা করতেন। চাকরি জীবনের নানা ঘটনায় তিনি উপলব্ধি করলেন পরাধীন দেশে কোন অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি তাঁতবস্ত্র পরতে শুরু করেন এবং বিদেশী দ্রব্যসম্ভার বর্জনের শপথ গ্রহণ করেন।

আরও কতগুলি কারণে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ আরও গভীর হোল। প্রথমত তিনি দেখলেন সরকারী চাকরির বড় বড় পদগুলো সবই ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত। যোগ্যতা থাকলেও ভারতীয়দের জন্য সেইসব চাকরির পথ রুদ্ধ। দ্বিতীয়ত সমসাময়িক ইতিহাসে খ্যাত দাক্ষিণাত্য রায়ত বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে দরিদ্র কৃষকদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলেন। তৃতীয়ত ১৮৭৬-৭৭ সালের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লোক অনাহারে এবং মহামারীতে মারা যায়। অসহায় মানুষ দুমুঠো অন্নের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় করলো। আর এই সুযোগে কিছু মিশনারি খাদ্যের লোভ দেখিয়ে, দরিদ্র, না খেতে পাওয়া মানুষগুলোকে, ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতে লাগলো। এই সব ঘটনা বাসুদেবকে গভীর

ভাবে নাড়া দিলো। তিনি এইবার সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধতা করলেন। তাঁর বাড়ি হয়ে উঠলো ইংরেজ বিরোধী কর্মপন্থা নির্ধারণের গোপন আস্তানা। এমনকি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গোপিকা বাঈকেও তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মামার বাড়ি। বিদায়লগ্নে ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা অর্জন হলেই আবার তাদের দেখা হবে, শুধু যতদিন দেশের স্বাধীনতা না অর্জিত হয় ততদিন তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা হবে না।[১৩]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। আর তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ। কিন্তু যাদের প্রচুর অর্থ আছে তারা স্বেচ্ছায় তা দিতে চাইবে না। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের একমাত্র পথ হল ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা। তিনি সেই পথই অবলম্বন করলেন। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হোল তাঁর অভিযান। পুলিশের হাত এড়ানোর জন্যে তাঁকে ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হোত। এবং তিনি 'কাশীর সন্ন্যাসী' বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে অনেক সময় 'দ্বিতীয় শিবাজী'ও বলা হত। তাঁর অনুগামীদের কাছে তিনি ছিলেন 'মহারাজ'। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কানে কুন্তল, লম্বা কালো চুল ফেটায়-বাঁধা, লম্বা দাড়ি বুকের উপর নেমে এসেছে। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। কোমর থেকে সর্বদা তরবারি ঝুলছে।

শিবাজীর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গড়া। বাসুদেবের স্বপ্ন ছিল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বাসুদেবের নিজের লেখা আত্মজীবনী থেকেই তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রচণ্ড স্বদেশানুরাগ কিভাবে উন্মত্ততায় পরিণত হয়েছিল এবং আরও কিছুদিন সময় পেলে তিনি যে ভারতের সমস্ত জায়গায় সংগঠন বিস্তার করে ইংরেজ বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলতেন সে সদিচ্ছার কথাও জানা যায়। কিন্তু তাঁর এই প্রবল দেশাত্মবোধ যে সার্থক হতে পারেনি তার কারণ হিসেবেও বলা যায় যে তিনি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার আগেই এসেছিলেন। তাই তিনি শুধু বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, সাফল্য লাভের সময় তখনো আসেনি। ফড়কের ব্যর্থতার আরও একটা কারণ ছিল তাঁর ধৈর্যের অভাব। কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাফল্য লাভ করতে না পেরে প্রচণ্ডভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়াও ছিল ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের প্রতি যে নিষ্ঠুর পীড়ন ও অপমান সহ্য করতে হয় তা ভেবেও তিনি উন্মত্ত হয়ে পড়তেন। এবং

এই কারণেই তাঁর দেশাত্মবোধে ছিল এই ধরণের মাত্রাহীন প্রাবল্য।[১৫] বাসুদেবের সরকারী চাকরি ত্যাগ করার পিছনেও ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর বেদনা।[১৬]

বাসুদেবের বিপ্লবী জীবন অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল, কারণ তিনি নিদ্রিত অবস্থায় মেজর ড্যানিয়েলের হাতে বন্দী হন এবং অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এডেনের বন্দীশালায় নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক পরিবেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তবে ইতিহাস তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তার যে গভীর প্রভাব পড়েছিল ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সে সম্পর্কে লিখে গেছেন।[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্র বাসুদেবের জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ফাড়কের মতো বিখ্যাত মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এ কথাও ভাবা কষ্টকর। বঙ্কিমচন্দ্রের মত একজন সমাজ সচেতন লেখককে যে এই রকম নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের জীবন আকৃষ্ট করবে তাতে সন্দেহ কি? বিশেষ করে সেই সময়কার বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় (ইংলিশম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা) তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখা হোত। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল বাসুদেবের জীবনী ও দিনলিপির অনুবাদ। সংকলক ও প্রকাশক দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের একজন স্বদেশানুরাগী লেখক ও বিশিষ্ট সম্পাদক। অনুবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল—'অপূর্ব ভারত উদ্ধার'। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার উৎসাহী এবং নিয়মিত পাঠক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই এই ধরণের সংবাদ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তাছাড়া 'আনন্দমঠ' ও বাসুদেব সমসাময়িক। সুতরাং সমকালীন একটি উল্লেখযোগ্য চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্পর্কে বঙ্কিমের মত একজন স্বদেশ প্রেমিকের ঔদাসিন্য কখনোই সম্ভব মনে হয় না। তিনি বাসুদেবের কাহিনী জানতেন ধরে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র মত একটি উদ্দাম দেশপ্রেমের কাহিনী লিখতে কল্পনার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন ফাড়কের জীবন ও চিন্তা থেকে। 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী, সন্তান সম্প্রদায়ের নেতা, সত্যানন্দ ও বাসুদেব দুজনেরই ছিল স্বাধীনতার জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁদের দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল এমন এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ধর্মাচরণে থাকবে স্বাধীনতা, সবাই খেতে পাবে, সবাই সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় আত্মমর্যাদার সঙ্গে বসবাস

করতে পারবে। ধর্মাচরণের দিক থেকেও সত্যানন্দ ও বাসুদেবের মধ্যে মিল রয়েছে। 'আনন্দমঠ' এবং ফাড়কের দেশপ্রেম দুয়েরই সূচনা এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ থেকে। অন্য মিলও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও ফাড়কে দুজনেই ত্যাগ ও ধর্মের পথে দেশের মুক্তির কথা বলেছেন। অর্থাৎ হয়তো বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কঙ্কালের উপর বঙ্কিমচন্দ্র বাসুদেবের রঙ লাগিয়ে 'আনন্দমঠ' লিখেছেন। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণ নেই। কিন্তু এই অনুমান অসঙ্গতও নয়, অসম্ভব তো নয়ই।

বাসুদেবের দলে যোগ দিতে যে সব তরুণরা আসত তারা শপথ নিত—'I shall respond to the call of my nation sacrificing my all at the altar of my motherland.'[১৮]

এই শপথের প্রতিধ্বনি যেন আমরা পাই 'আনন্দমঠে'। প্রথম সংস্করণ এবং পরবর্তী সমস্ত সংস্করণে ও আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় আছে মনস্কাম সিদ্ধির জন্য "পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব"। প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে? আর কি দিব?"

"তখন উত্তর হইল, ভক্তি।"[১৯]

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল 'সন্তান' শব্দটি। অবশ্য বাসুদেবের মূল মারাঠী আত্মজীবনীতে ঠিক এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু মূল শব্দটির ভাবানুবাদ করে 'সন্তান' শব্দটি পাওয়া যেতে পারে। বাসুদেব নিজেকে দেশের নাগরিকদের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করতেন। 'আনন্দমঠে'র সেবকরাও দেশমাতৃকার সন্তান।

তবে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে সম্বন্ধে এই বিস্তারিত আলোচনার উপসংহারে এই কথা বলা হয়তো অসমীচীন হবে না যে বঙ্কিমচন্দ্র বাসুদেবের জীবন থেকে 'আনন্দমঠ' রচনার কল্পনাগত সহায়তা পেলেও এ উপন্যাসের শিল্পরূপ তিনি দিয়েছেন আপন প্রতিভায়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস ও বাসুদেবের জীবন থেকে উপাদান নিয়ে তিনি বিদ্রোহের একটি নতুন ভাবমূর্তি সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছিলেন।[২০] 'আনন্দমঠ' রচনার প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক না কেন লেখকের অন্তরে দেশপ্রেমের অতি উচ্চ আদর্শের সঞ্চার না হলে এ রকম রচনা সম্ভব হয় না।[২১] সমস্ত প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার শেষে এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। নইলে এ উপন্যাসের লেখকের প্রতি অবিচার হয়।

॥ দুই ॥

সত্যিই কি অনন্যমাতৃক !

'সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক'—শান্তির সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে এই কথা বলেছেন সত্যানন্দ। বস্তুত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সমস্ত প্রধান চরিত্রকেই সন্তান মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হয়েছে। সেই দীক্ষায় নানা বিধি নিষেধের বেড়ি আছে, তবে সন্তান ধর্মের মূল কথা উপরের পংক্তিটিতে সত্যানন্দ ব্যক্ত করেছেন। এই কথা ভবানন্দ ও জীবানন্দ এমনকি দীক্ষান্তে মহেন্দ্রের মুখেও শোনা যেতে পারতো।

'আনন্দমঠ' লেখার আগে চার বছর বঙ্কিমচন্দ্র কোন উপন্যাস লেখেন নি। 'আনন্দমঠে'র চারবছর পূর্বে (১৮৭৮) তিনি লিখেছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। সেই উপন্যাসের বিষয় রূপজ মোহ। সে উপন্যাসের ট্র্যাজেডি রূপজ মোহের পরিণামে এসেছে। মূলত 'বিষবৃক্ষ' রচনার পর থেকেই নানা রচনায় রূপজ মোহের পরিণতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা বারবার ব্যাপৃত হতে দেখি। 'বিষবৃক্ষে'র পরে 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' এবং সর্বশেষে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রূপজ মোহের ঈষৎ আরোপিত এক ভয়াবহ পরিণাম বঙ্কিম এঁকেছেন। যে পুরুষ বা নারী রূপতৃষ্ণাতেও কর্তব্য বা ধর্মচ্যুত হয় না সেই জীবানন্দ বা শান্তি বা প্রতাপ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাপ্রাপ্ত মানুষ। রূপের বা কামের কাছে পরাজিত ফষ্টার, দেবেন্দ্র, গোবিন্দলাল, রোহিনী বা হীরাকে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমার যোগ্য মনে করেন না। ক্ষমা পান সাময়িক বিচ্যুত নগেন্দ্র, শৈবলিনী এবং সম্ভবত অমরনাথ। তাও কোন রকমের প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তিলাভের পর। এ উপন্যাসও দেখছি এ চক্রের বাইরে নয়, মনস্কামনা প্রকাশের কারণে বীর ভবানন্দ এখানে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

অথচ 'আনন্দমঠ' নরনারীর প্রণয় সম্পর্কিত উপন্যাস নয়। যে মারাঠাবীর এই উপন্যাসের নেপথ্যে আছেন তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি।[২২] প্রণয় পিপাসা ফড়কের জীবনে বিপত্তি নিয়ে আসেনি। কিন্তু এই স্বাদেশিকতার উপন্যাসে দুজন প্রধান সন্তানের কাছেই প্রণয়সম্পর্ক বৃহত্তর বিপত্তি হয়ে দাঁড়ালো। এমনকি মহেন্দ্র, সত্যানন্দ, জীবানন্দ ও ভবানন্দ এই চারটি চরিত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য প্রণয় ও নারী সংসর্গের বিষয়ে এরা চারজন চার রকম মানুষ বলে।

ফড়কের সমস্যা ছিল অনুগামীদের দেশপ্রেমহীনতা ও কিঞ্চিৎ ভাড়াটে মনোভাব। বঙ্কিমের সন্তানদলের সে সমস্যাও ছিল, কিন্তু প্রধান নেতারা সেখানে পরস্পরের সঙ্গে পৃথক শুধুমাত্র প্রণয়সূত্রে। সত্যানন্দ প্রথমাবধি জিতেন্দ্রিয়। অন্যদিকে ভবানন্দ ইন্দ্রিয়ের বশ, জীবানন্দ ও শান্তি দাম্পত্য প্রেমকে 'মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে'র ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে সত্যানন্দের দুই প্রধান সেনাপতি ভবানন্দ ও জীবানন্দ প্রণয় সম্পর্কের জন্যে আত্মবিসর্জনের সংকল্পও গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ভবানন্দ আত্মবিসর্জন করেওছেন। তাঁর স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন সামান্য প্রণয় আকাঙ্ক্ষার অপরাধে বলীপ্রদত্ত হোল। এসব দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো ভেবেছিলেন যে দেশপ্রেমের মূল বিরোধী শক্তি হচ্ছে স্বাভাবিক দাম্পত্যপ্রেম। এমনকি স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনও।[২৩] যার প্রমাণ মহেন্দ্র ও কল্যাণীর উপাখ্যানে।

এইভাবে এই উপন্যাসের চরিত্রকল্পনা একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র বা 'রজনী'র অমরনাথের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্যে রূপজ মোহ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। নগেন্দ্রের ক্ষেত্রে কুন্দনন্দিনী ও অমরনাথের জন্যে ললিতলবঙ্গলতার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু ভবানন্দের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐ একই রূপজ মোহের চাবি ঘুরিয়ে চরিত্রের অন্দরমহল আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন ও পরিণতিতে সেই শৈবলিনী নগেন্দ্র বা গোবিন্দ-লালের মতো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রাখেন তখন সমগ্র বিষয়টিকে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পক্ষে বেমানান বলে মনে হয়। স্বাদেশিকতার প্রতিযোগী শক্তি হতে পারে সাম্প্রদায়িকতা, ভীরুতা, লোভ, কাপুরুষতা, সুযোগসন্ধানী আদর্শ-হীনতা। প্রেম-কামনা এ সবও হতে পারে। আবার নরনারীর প্রেম স্বাদেশিকতার সহযোগী শক্তি নাকি প্রতিযোগী শক্তি তা নিয়ে মতভেদও হতে পারে। বঙ্কিম যদি প্রতিযোগী শক্তি বলে ভেবে থাকেন তবে বলতে হবে তিনি একটি বিষয় নিয়ে পুনরাবৃত্তি ও বাড়াবাড়ি করেছেন। যে মানুষ মাতৃভূমি ছাড়া অনন্যমাতৃক তাঁর চরিত্র শুধুমাত্র দেশপ্রেমের মাপকাঠিতেই ধরা যেতে পারতো। একটি মানুষ দেশের জন্যে কতটা আত্মত্যাগ করতে পারেন সেই প্রশ্ন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে উঠেছিলো। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসে নেই। একমাত্র মহেন্দ্র ও জীবানন্দ চরিত্র দুটির গতি সেইদিকে ছিলো। একজন ছেড়েছিলেন স্ত্রী ও কন্যা। অন্যজন এমন স্ত্রীকে যে স্ত্রী অতুলনীয়া এক নারী। কিন্তু মহেন্দ্রের সংগ্রাম উপন্যাসে শেষ হয়নি। জীবানন্দকেও অযথা হিমালয়

যেতে হয়েছে। স্বয়ং সত্যানন্দকেও চিকিৎসক সংগ্রামের মাঝপথ থেকে তুলে নিয়ে গেছেন। ফলে যে মানুষ ইংরেজ আমলের সূচনায় এই দেশমাতৃকাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে যাত্রা শুরু করে, তার পরিণতি এই উপন্যাসে নেই। অন্যদের ক্ষেত্রেও উপন্যাস স্বাদেশিকতার আহ্বানে শুরু হয়ে ক্রমাগত ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রবেশ করেছে। ইংরেজ বা অন্যকেউ যেই প্রতিপক্ষ হোক না কেন সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত আর প্রাধান্য পেলো না। সন্তানরা নিজের প্রবৃত্তি ও কামনার সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবে বহিরাগত চিকিৎসক উপন্যাসের ইতি টানলেন। ফলে সমস্ত চরিত্রের সমস্ত দর্শনের এখানে শুধুমাত্র সূচনা আছে সমাপ্তি নেই। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে' এক অসাধারণ উপন্যাসের সূচনা আমরা পেলাম কিন্তু শেষ স্তরে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অতি সাধারণ উপসংহার। এ উপন্যাস শুরু হলো শেষ হলো না।

সত্যানন্দের প্রসঙ্গ ধরেই এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। উপন্যাসের উপক্রমণিকায় আমরা একটি অসাধারণ বাক্যালাপ শুনেছি। বাক্যালাপটির পাত্র-পাত্রীর নাম নেই কিন্তু অনুমান করা যায় এ আলাপ হয়েছে সত্যানন্দের সঙ্গে সেই রহস্যময় চিকিৎসকের। 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরে চিকিৎসক প্রশ্ন করেছেন, 'তোমার পণ কি?' সত্যানন্দের জীবনপণ সংকল্পের কথা শুনে চিকিৎসক বলেছেন, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।' একথায় বিস্মিত হয়ে সত্যানন্দ প্রশ্ন করেছেন 'আর কি দিব?' 'তখন উত্তর হইল ভক্তি।' প্রথমত জীবন তুচ্ছ এবং তা সকলেই ত্যাগ করতে পারে এই বিবৃতিটি বিস্ময়কর, কারণ জীবন কি ঠিক ততখানি তুচ্ছ!—এই বাক্যালাপের সুর থেকে আমাদের মনে হয় দুজন মহান পুরুষ জাগতিক অনেক ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে কোন মহত্তর আদর্শের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকদ্বন্দ্বে এখানে নিয়োজিত হয়েছেন। সেই স্তরে জীবন তুচ্ছ হতেই পারে। উচ্চতর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অনেকবারই তুচ্ছ হয়েছে। বস্তুত এই উপক্রমণিকাটি একাধারে সত্যানন্দ চরিত্র ও উপন্যাসের সুর একটি উচ্চতম স্বরগ্রামে বেঁধে দিয়েছে। এরপর আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই নিরীক্ষার বিষয় হয় জীবনদান যার কাছে সহজ সেই সত্যানন্দ কতটা 'ভক্তি' দিতে পারছেন। এবং তাঁর স্বদেশউদ্ধারের মনস্কামনা কতটা সিদ্ধ হচ্ছে সেদিকে।

এই প্রসঙ্গে 'ভক্তি' কথাটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। এই কথাটির নানারকম ব্যাখ্যা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে আছে। রামকৃষ্ণ বলতেন 'শুদ্ধা ভক্তি'-র কথা। বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তি বলতে কি বুঝতেন তার উল্লেখ আছে 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে।[২৩] আনন্দমঠের পরবর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এই প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত আছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে ভবানী পাঠক এবং প্রফুল্লের আলোচনায় কি রকম কর্ম করা উচিত তার একটি পরিচ্ছন্ন উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র রেখেছেন'। অন্তত পাঁচটি গীতাশ্লোক উল্লেখ করার পরে প্রফুল্ল বলেছেন—

'কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম তাহার, আমার নহে। কর্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্মের জন্যে যাহা করিতে হয় করি।'

নিষ্কাম ধর্ম উদ্‌যাপনের এই মানসিকতা এই উপন্যাসে ভক্তি শব্দে নির্দেশিত হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে 'ভক্তি' বিষয়টি আত্মত্যাগ থেকেও কঠিন, অধিক ব্যঞ্জনাময়ও। এই শব্দের সোজাসুজি আভিধানিক অর্থকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সাংকেতিক কথাবার্তায় ব্যবহার করেননি বলেই মনে হয়।

'ভক্তি' অর্থে যদি নিষ্কাম ধর্মসাধনার কাছাকাছি একটি বিষয় নির্দেশিত হয়ে থাকে তবে সত্যানন্দ সেই দিকেই এই উপন্যাসে আত্মচালনা করেছেন। কিন্তু এই দৈবী অনুজ্ঞা সমস্ত মহিমা হারালো উপন্যাসের শেষে। এই ক্ষয়ের সূচনা হয়ছিল উপন্যাসের মাঝখানেই। এই সময় আমাদের দেখতে হয় যে সত্যানন্দের কোনো অন্তর-পরিচয় এ উপন্যাসে নেই। তাঁর মনের ভিতরটা আমরা দেখতে পাই না। ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি এমন কি সন্ন্যাসী জনতার মানসিকতাও এই উপন্যাসে বেশ ভালো রকম পরিস্ফুট। ওরা সবাই মানুষ। কিন্তু সত্যানন্দকে যেন অনুভব করা যায় না। তিনি যেন আকাশ থেকে নামানো দৈবী কোন প্রস্তরমূর্তি। তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, জীবন বৃত্তান্ত নেই, তাঁর মন দেখা যায় না। এর কারণ হয়তো উপক্রমণিকার নির্দেশে আছে। সে নির্দেশে সত্যানন্দ সর্বদাই যেন 'চার্জড' হয়ে আছেন। যে কারণেই হোক তিনি যেন ঠিক মানুষ নন। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের আগে পর্যন্ত তিনি মানুষ ও দেবতার মাঝামাঝি একটা চরিত্র যিনি কোন সংশয় প্রকাশ করেন না, নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যেন পৌরাণিক

কাহিনীর কোনো ঋষি। এ মানুষটি যে-সমস্ত উক্তি করেন তার অধিকাংশই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়, সিদ্ধান্ত। উপন্যাসের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত এই দৈবী চরিত্রটি উপক্রমণিকার পরেই এমন কি ভুল করলেন যাতে আরো এক বৃহত্তর দৈবী চরিত্রকে এসে সত্যানন্দকে প্রত্যাহার করে নিতে হোল। এই বিষয়টি এই উপন্যাসে বুঝবার উপায় নেই। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কৈফিয়ৎ হাজির করেছেন এবং সবশেষে তা সত্যানন্দের মাথায় প্রবলবেগে ছুঁড়ে মারার পর উপন্যাসের শেষ পাতায় সত্যানন্দ প্রথম মানুষ হলেন। উপন্যাসের প্রথম থেকেই সত্যানন্দ যদি মানুষ হতেন, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর দ্বন্দ্ব, তাঁর মহত্ত্বের পশ্চাৎপট এ-সব যদি জানা যেত, তাহলে 'আনন্দমঠ' আরও উৎকৃষ্টতর শিল্পসৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হোত। কিন্তু তা হোল না। এমন একটি সত্তা এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রস্থলে বসে রইলেন যাঁর কোন আদি অন্ত নেই। যিনি এক অন্ধকার বনভূমিতে এক দুর্দান্ত প্রশ্ন নিয়ে আবির্ভূত হন। শেষে এক ধূসর রাত্রে হিমালয় শিখরের দিকে যাত্রা করেন। এই ভাবেই এই উপন্যাসে বিসর্জন এসে প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে যায়। দেশভক্তি থেকে দেশ চলে যায় শুধুমাত্র ভক্তি থাকে।

একই পরিণতি ভবানন্দ চরিত্রেরও। বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্কামধর্মের সর্বপ্রথম স্তর ইন্দ্রিয়দমন। ভবানন্দ এই স্তর অতিক্রম করতে পারেননি। এইজন্যে ভবানন্দের আত্মহত্যা 'আত্ম-বিসর্জন' নামে আমাদের পড়তে হয়। ভবানন্দ আনন্দমঠের প্রধানতম স্বদেশকর্মী। সন্তানদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমরা ভবানন্দের কণ্ঠেই 'বন্দেমাতরম' শুনেছি, বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে ভবানন্দকে কাঁদতে দেখেছি। মহেন্দ্রকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দিয়েছে ভবানন্দ। এই উপন্যাসের স্বদেশপ্রেমের সবথেকে মরমী কথাটি আমরা শুনেছি ভবানন্দের কণ্ঠে। সেই বলেছে 'আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই-নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,—'এই মানুষটি যখন রূপমুগ্ধ হয় তখন ঔপন্যাসিক একটি অসাধারণ বৈপরীত্যের মুখোমুখি হন। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এই দ্বন্দ্বে আত্মনিয়োগ করেন না। উপন্যাসে এই স্ববিরোধিতার বিকাশ ঘটেনা। ভবানন্দের আত্মদংশন বিকশিত হবার পথ অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রশুদ্ধির বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এমন একটি যুদ্ধে ভবানন্দ

আত্মবিসর্জন করেছে, যে যুদ্ধে আত্মবিসর্জনের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচার একদিকে, অন্যদিকে দেশরক্ষা। উপন্যাস রচনায় এ-দুটি প্রান্তের দ্বন্দ্ব যদি কখনও উপস্থিত হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিধর্ম-রক্ষাকেই বেছে নেন। এই অতিরিক্ত ধর্মরক্ষার আগ্রহ জীবানন্দ চরিত্রেও আছে। স্বদেশ উদ্ধারের জন্যে জীবানন্দ সন্তানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে তাকেও ধর্মপথের যাত্রী করে তুলেছেন। দেশ বনাম সংসার এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে জীবানন্দ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু শেষে এই দুই প্রান্ত ছেড়ে সে গিয়ে পড়লো ধর্মপথে এবং সেই যাত্রার পূর্বসূচনা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হোল না। অর্থাৎ এই উপন্যাস স্বদেশপ্রেম থেকে শুরু হলেও এর যাত্রা মূলত মুক্তির দিকে। দেশ এবং দেবতার এই দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবে আসার কথা নয়। কিন্তু এসেছে। এবং যখনই বেছে নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে তখনই দেশাত্মবোধক ভাবসমূহকে পিছনে ঠেলে দৈবী বিষয়সমূহ সম্মুখবর্তী হয়েছে। বস্তুত বঙ্কিমের শেষ তিনটি[২৮] উপন্যাসে ধর্মের ও ধর্মতত্ত্বের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে অনেকেই আপত্তি করেছেন। এই আপত্তি খুব অসংগতও নয়। ধর্মপ্রবণতা ও দৈবী বিষয়-সমূহের উচ্ছ্বাসে এই উপন্যাসেও দেশপ্রেম শেষ পর্যন্ত অনেকটাই উবে গেছে। আনন্দমঠে কোন ট্র্যাজেডি যদি থাকে তবে দেশপ্রীতির এই অন্তিম বিলোপন হচ্ছে সেই ট্র্যাজেডি।

॥ তিন ॥

আনন্দমঠ : পাঠপরিবর্তন : উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। এরমধ্যে প্রতিটি সংস্করণেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠের বদল করেছেন। সব থেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে তৃতীয় ও পঞ্চম সংস্করণে। 'আনন্দমঠ' প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৮৮২ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ সালে, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ ১৮৮৬ সালে, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৯২ সালে।

যে কোনো সাহিত্যিক তাঁর রচনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন এমনকি বর্জনও করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন করতে করতে সাহিত্যের খাতায় বিপুল

কাটাকাটির সূত্রে চিত্রশিল্পের জগতে প্রবেশ করেছেন। কবিতায় প্রচুর পরিবর্তন করেছেন জীবনানন্দ দাশও। রবীন্দ্রনাথও তার প্রথম জীবনের অনেক কবিতাকে শেষ জীবনে এসে পরিহারও করেছেন। লোকশ্রুতি আছে রাম-প্রসাদ তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যটিকে লজ্জার সঙ্গে পরিহার করেছিলেন। যে কালিদাস 'রঘুবংশম্' লিখেছেন, 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' যাঁর রচনা, 'কুমার-সম্ভাবমের' সৃষ্টি তাঁর কাছেও হয়তো অস্বস্তিরই ছিল। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই এই যন্ত্রণা থাকে। প্রত্যেকেই তাঁর উৎকৃষ্টতম সৃষ্টির পাশে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতে চান। যে সৃষ্টি অসম্পূর্ণ তাকে হয়তো বারবার পুনর্নির্মাণ করে রসোত্তীর্ণ করে নিতে চান রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো। যেখানে পুনর্গঠন একেবারেই অসম্ভব, যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ক্ষেত্রে, সেইখানে সেই সৃষ্টিকে বর্জন করতে চান।

এইরকম চাইবার অধিকার প্রত্যেক সাহিত্য স্রষ্টারই আছে। কিন্তু বাইরের কোনো চাপে, কোন লোভে, বা ভয়ে, শিল্পী যদি সেই পরিবর্তন করেন, তখন তা একটি শিল্পবিরুদ্ধ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনন্দমঠের পাঠ পরিবর্তনের বিষয়টি দীর্ঘকাল একটি অভিযোগ হিসেবে উল্লিখিত হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চাকরিরক্ষার জন্যে এবং ইংরেজ সরকারকে তুষ্ট করার জন্যে আনন্দমঠের সংলাপ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, স্বাদেশিকতার ব্যাখ্যা, সমস্তকিছুর পরিবর্তন করেছিলেন একথা অনেকেই মনে করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। বিশেষ করে যে উপন্যাসে এই দেশ প্রথম স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র শুনলো[২৮] সেই উপন্যাসেই যদি লেখকের সমঝোতা থাকে তবে তা নান্দনিক বা আদর্শগত কোন দিক থেকেই খুব গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে হয় না। তাই এই উপন্যাসের পাঠভেদ উদ্দেশ্যমূলক পাঠভেদ কিনা, ইংরেজ শাসকদের মনস্তুষ্টি ঘটাবার জন্য এই পাঠান্তর পরিকল্পিত হয়েছে কিনা সেই বিচার শেষ করে আমরা এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

'আনন্দমঠ'-এর প্রথম সংস্করণে সন্তানদলের প্রতিপক্ষ ছিল ইংরেজরা। এবং এই উপন্যাসে স্বদেশপ্রীতির যে সুর, মাতৃভূমির লাঞ্ছনামুক্তির যে প্রেরণা এ লেখায় অনুস্যূত হয়ে আছে, তাতে ইংরেজই এ উপন্যাসের স্বাভাবিক প্রতিপক্ষ। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমাগত 'ইংরেজ'-এর বদলে মুসলমান, যবন, নেড়ে প্রভৃতি শব্দ ব্যহার করতে শুরু করলেন। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ-১৫১) থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :—

> 'ভবানন্দ বলিল, 'ভাই ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে,……ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—'

এই বর্ণনাটি দ্বিতীয় সংস্করণে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ালো :—

> 'ভাই নেড়ে ভাঙ্গিতেছে……ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না।'

এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ভবানন্দ পঞ্চাশজন ইংরেজকে নিহত করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণ সমূহে এই পঞ্চাশজনের বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো, 'কয়েকজন ইংরেজকে'। একা ভবানন্দ মৃত্যুর পূর্বে পঞ্চাশজন ইংরেজকে নিধন করলেন, এই অসম্ভব বীরত্বকে স্বাভাবিক করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চাশকে কয়েকজনে নামিয়েছেন, নাকি এও ইংরেজ তোষণ, সে সংশয় থাকে। এ ছাড়াও এরকম ইংরেজতোষণের (!) বহু নিদর্শন আনন্দমঠের পরবর্তী সংস্করণসমূহে আছে। হেষ্টিংস সম্পর্কে নিন্দাত্মক উক্তি শেষদিকের সংস্করণে প্রশংসাসূচক হয়েছে। অভিযোগ এসব কারণেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শেষাংশ এই উপন্যাসের সূচনার সঙ্গে খাপ খায়নি। ইংরেজ রাজা হলে দেশের কেন যে ভালো হয় এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয়নি। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংরেজ জাতি বাহ্যগুণ সম্পন্ন, কিন্তু এই যুক্তিও যে বানানো এবং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে এই যুক্তি স্বীকার করতেন না তারও প্রমাণ আছে কমলাকান্তের দপ্তরে।[২৭] বস্তুত ঔপন্যাসিককে সরিয়ে শেষাংশে এক ব্যাখ্যাতা বঙ্কিম এসে হাজির হয়েছেন। সত্যানন্দ ব্যর্থ হলে উপন্যাস ট্র্যাজিক হোত। সেই পরিণতি শিল্পের সীমানায় থাকতো। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেন ইংরেজ শাসনের এক প্রচারক হয়ে পড়লেন। উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন 'মা যা ছিলেন; মা যা হইয়াছেন এবং মা যা হইবেন।' এই তিন মূর্তি। হৃতসর্বস্বা নগ্নিকা মায়ের কঙ্কালমালিনী মূর্তিকে শত্রুবিমর্দ্দিনী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী মূর্তিতে রূপান্তরিত করার সঙ্কল্প নিয়ে এ উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখলাম যুদ্ধবিজয় সত্বেও এক অলৌকিক চিকিৎসক এসে সত্যানন্দকে কিছু ইংরেজ

স্তুতি শুনিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হিমালয়ে নিয়ে গেলেন। ফলে এ উপন্যাস কার্যত সমাপ্ত হোল না। উপন্যাসকে জোর করে সমাপ্ত করানো হোল। উপন্যাসের সমস্ত গতি যে দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো মোহনায় এসে বলা হোল সেই দ্বন্দ্বটাই অপ্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য এ রকম স্ববিরোধীতা অজ্ঞাতে ঘটানোর মতো দুর্বল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না। এ হচ্ছে একটি জোড়াতালিকৃত ব্যবস্থা। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির শেষ অধ্যায় অন্যরকম করে লেখা হয়েছিল এ কথারও প্রমাণ আছে।[২৮]

এরপরে প্রশ্ন উঠবে ইংরেজকে তুষ্ট করার কোন কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল কিনা? এবং ইংরেজরা যে 'আনন্দমঠ' রচনায় ফলে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার কোন প্রমাণ আছে কিনা? এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ তথ্যাবলী বিবেচনা করা যেতে পারে।

সেই সময়ে চণ্ডীচরণ সেন 'লঙ্কাকাণ্ড' নামে ব্রিটিশ শাসনে বাংলার অবস্থার বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা দিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে তিনিও বইটার প্রচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ পরবর্তী কালে বইটি কোথাও পাওয়া যায় না। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণকে পদোন্নতি থেকেও বঞ্চিত হতে হয় 'মহারাজা নন্দকুমার' লেখাটির জন্যে।[২৯] এই একটি ঘটনা থেকেই সহজেই বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রও যদি পরাধীন দেশের সরকারী চাকুরে হিসেবে একটু সংযোজন-বর্জনের আড়াল গ্রহণ না করতেন তাহলে চণ্ডীচরণের মতো তাঁরও হয়তো একই পরিণতি হোত। বস্তুত হয়েও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকমাসের জন্যে কোলকাতার একটি উচুপদ[৩০] পেয়েছিলেন 'আনন্দমঠ' প্রকাশের কিছু পূর্বে। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে সে চাকরী তাঁর যায় কোনো অনির্দেশিত কারণে। অনুমান করি সেই কারণ আনন্দমঠের প্রথম প্রকাশ। এ কারণেই হয়তো আরও বৃহত্তর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার্থে বঙ্কিম কিছু কিছু পাঠ বদলিয়েছেন।

কিন্তু এই অভিযোগের সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে শুধু সরকারকে তুষ্ট রাখাই যদি তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হোত তবে তিনি ইচ্ছা করলে বইটির প্রচারও বন্ধ করে দিতে পারতেন। বই বন্ধ করলে ইংরেজ সরকার হয়তো আরও খুশি হতেন। হয়তো তাঁর আরও পদোন্নতি ও খেতাববৃদ্ধি হোত। কিন্তু ইংরেজ সরকারকে তুষ্ট করার জন্য তিনি তা করেন নি। তিনি

বইটির প্রচারও অব্যাহত রেখেছিলেন। এবং সে জন্যে তাঁর সার্ভিস রেকর্ড[১১] খারাপ হয়েছে, পদোন্নতি ব্যাহত হয়েছে, তবু তিনি আনন্দমঠের সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সমঝোতা ও দুঃসাহসের একটা মিশ্রণ এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল। ছিল বুদ্ধিমত্তাও। তাই কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন করলেও কাহিনীর মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য থেকে তিনি সরে আসেননি। এ জন্যই নানা রকমের স্ববিরোধিতা সত্বেও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আনন্দমঠের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বাধীনতাকামী মানুষেরা 'আনন্দমঠ' পড়ে দীর্ঘকাল ধরে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে, যদিও 'আনন্দমঠে'র পাঠপরিবর্তন বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার চিন্তাকে অস্পষ্ট করেছে, তবুও এই অস্পষ্টতা ইচ্ছাকৃত এবং এই অস্পষ্টতাকে তিনি নিজেও বোধকরি কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন উপন্যাসটির শেষ বাক্যে। চিকিৎসক সত্যানন্দকে হিমালয়ে নিয়ে গেলেন ; এই কথার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।' বলেছেন ধর্ম এসে কর্মকে ধরেছে। ব্যঙ্গ বলছি এই জন্যে যে ধর্মতত্ত্বের শেষ অংশে বঙ্কিম দেশপ্রেমকে সমস্ত ধর্মের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। সেই ধর্ম এখানে এসে দেশ-প্রেমিককে, প্রতিষ্ঠাকে, বিসর্জ্জিত করছে। এই উক্তির পেছনে রসসন্ধানী সতর্ক পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো একটি সূত্র ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মের চর্চা পরবর্তী জীবনে করেছেন সে ধর্মের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক এরকম খাদ্যখাদকের নয়। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মণ সেনের বৈষ্ণব ধর্মমতকে ব্যঙ্গ করেছেন। কারণ সেখানে ধর্ম কর্মকে বিঘ্নিত করেছিল। যে ধর্ম কর্মের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না বঙ্কিম বরাবর সেই ধর্মের জয়গান করেছেন। এখানে উল্টো হল। কারণ কি ? আমার অনুমান, দেশপ্রেমিক বঙ্কিম এখানে ইংরেজভীত বঙ্কিমকে উদ্দেশ করে শেষতম পরিহাসটি রেখে গেলেন ভাবী কালের কাছে। এই বিষয়টিই উপন্যাসটির চূড়ায় আজও একটি নির্দেশিকা হয়ে আছে। বাইরের চাপে, আত্মরক্ষার্থে জোর করে লেখককে তাঁর সৃজনকর্মের উপসংহারটি এখানে বদল করতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক পরিহাসছলে সে দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেলেন। নিজের অনিচ্ছাকৃত সংযোজনকে নিজেই ব্যঙ্গ করে গেলেন। 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

এ প্রসঙ্গে সব শেষে রাশিয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ আইভান পাভ্‌লোভিচ্ মিনায়েফের কথা বলা যেতে পারে। ফড়কের বিচারের কিছুদিন পরে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বেলা দশটা নাগাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মিনায়েফকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে যান। সেখানে রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মিনায়েফ বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ ঘুরে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। কিছুদিন আগে (নভেম্বর ১৮৮৫) ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ জয় করেছে। পরাজিত ব্রহ্মদেশের জন্য মিনায়েফের মনে বেদনা ছিল।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

> 'মিনায়েফ প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন সে দেশ (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কিনা? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহা ব্রহ্ম বিজয়ের অনুকূল নহে, কিন্তু কোন পুস্তিকা (Pamphlet) কেহ লেখে নাই। প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে ইহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারও সাহস হয় না।'[৩২]

আনন্দমঠের ক্ষেত্রেও আসল কথা বলবার সাহস সে যুগে কারও হওয়া কি সম্ভব ছিল? এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্র ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের শেষ বাক্যেও তার প্রমাণ আছে। কিন্তু ইংরেজের পীড়নের ভয়ে সেই বাসনাও তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। অনুমান করি এই সতর্ক মনোভাব আনন্দমঠের স্বদেশচিন্তাকে কিছুটা অস্পষ্ট ও ধর্মের আড়ালে প্রচ্ছন্ন করেছে। তবে সে যুগের প্রেক্ষাপটে এই সাহসের অভাবকে খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। তখনো এ দেশে স্বাদেশিকতার বিষয়টি প্রায় অকল্পনীয়। সেযুগের এক কবি ব্রিটেনের সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশ্যে যে কবিতা লিখেছেন তাতে নিজেদের সম্পর্কে বলেছেন—'আমরা সব পোষা গরু'। পৃথিবীতে ইংরেজ সূর্য তখন অস্ত যায় না। তা সত্ত্বেও প্রচ্ছন্নভাবে এবং

প্রকাশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ স্বদেশচিন্তার যে বিস্তার হয়েছে তা দীর্ঘকাল ধরে এই বহুভাষী ও বহুধর্মের দেশের মুক্তিকামী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের শেকল ছিঁড়তে অনুপ্রাণিত করেছে। সমঝোতা আনন্দমঠে ছিল, কিন্তু সেই সমঝোতা ছাড়িয়ে বিধ্বংসী বন্যার মতো ছিল দেশপ্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র এই আবেগ সঞ্চারের জন্যেই উপন্যাসটি বোধকরি রচনা করেছিলেন। সে প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। শুধু অরবিন্দের স্তুতিতে নয়, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধেও তার প্রমাণ আছে।

চতুর্থ অধ্যায়
টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. 'এই উপন্যাস এবং ইহার অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যত আলোচনা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন রচনা লইয়া তত আলোচনা হয় নাই।' —বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ সম্পাদকদ্বয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। সম্পাদকীয় ভূমিকা, আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃ-১। 'বন্দেমাতরম' বোধকরি এ দেশের সব থেকে বেশি অনূদিত কবিতাও। স্বাধীনতার পূর্বে শুধুমাত্র ইংরেজিতেই ৬ জন বিভিন্ন লেখক বন্দেমাতরমের অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন। তবে আনন্দমঠের অন্যান্য গান অতি সাধারণ স্তরের।

২. গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'আনন্দমঠ' প্রথমে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়েছিল সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠের' প্রকাশ সমাপ্ত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বা ইংরেজি ১৮৮২-র মে মাসে। কিন্তু পুস্তকাকারে ঐ বছরের ১৫ই ডিসেম্বরের আগে প্রকাশিত হয়নি।

৩. ইলবার্ট বিল: দ্রষ্টব্য: রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধ। সেখানে ইলবার্ট বিলের ইঙ্গিত আছে। বড়লাটের আইন-উপদেষ্টা স্যার সি. পি. ইলবার্ট একটি বিল আনেন তাতে বলা হয় য়ুরোপীয়ানদের ভারতীয় সিভিলিয়ানরা বিচার করতে পারবে। পূর্বে এই অধিকার বিচারপতিদের ছিল না। এই বিল তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করে।

৪. History of the Sanyasi Rebellion from Hunter's Annals of Rural Bengal—1860, P-70-72.

৫. History of the Sanyasi Rebellion, from Warran Hastings. Letters in Gleig's Memoirs. Vol. 1. 294.
বলাবাহুল্য সন্ন্যাসীরা জিপসী ছিল না। সদা পরিক্রমারত বলে হেস্টিংস জিপসী শব্দের ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ভারতীয় জিপসী বেদেরা আছে, তারা আর যাই হোক সন্ন্যাসী নয়।

৬. Sannyasi, Fakir Raiders of Bengal. (Bengal Secretariat Book Depot. 1930)—(যামিনী মোহন ঘোষ।)

৭. History of Freedom movement in India—প্রথম খণ্ড।

৮. ক) Gleig. Rev. G. R. Memoirs of the Life of the Right Hon. Warren Hastings. 3v. 1841.
খ) Hunter, W. W. Annals of Rural Bengal. 1860.

৯. যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিক ভূমিকা, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ 'আনন্দমঠ' ১৩৬৪ মুদ্রণ।

যদুনাথ সরকারের মত সমর্থন করে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন 'কিন্তু 'আনন্দমঠে' তিনি সন্তানদের যে জীবন, আদর্শ চরিত্র ও অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই'। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড।

১০. 'But Babu Bankim Chandra's Sannyasi, though possening high religious culture, are not Sannyasis of the ordinary mendicant type, nor are they, the mere bandits and robbers which Dr. Hunter's Sannyasis were......'. Report on publications Issued and Registered in the......British India for the year 1883. P. 55.

১১. সন্ন্যাসীদের বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা ভালোমানুষ করে দেখিয়েছেন। এ অভিযোগ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভিক্ষের চিত্রটি সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিকেরই কোনো অভিযোগ নেই। দুর্ভিক্ষের বর্ণনাটি সত্যিই ঐতিহাসিক। ইতিহাসে পাচ্ছি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ছিল মহম্মদ রেজা খাঁর উপর। স্বয়ং হেষ্টিংস তাঁর বিলাতের প্রভুদের জানিয়েছেন—

'The effects of the dreadful Famine which raged these provinces in the year 1770 and raged during the whole course of that year, have been made known to you......Notwithstanding the loss of at least one-third of the inhabitants of the Provinces, and the consequent decrease of the cultivation, the net collection of the year 1771 exceeded even that of 1768.

..It was to be naturally expected that the diminution of the Revenue Should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not, was owing to its being violently kept up to its former standard'. (W. Hastings to the Court of Directors, dated 3 Nov. 1772. Forrest, London).

হেষ্টিংসের পত্র থেকে আরও জানা যায় যে, কোম্পানীর মুসলমান নবাবরা খাজনা আদায়ের ব্যাপারে এতই নির্মম ছিলেন যে, ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ লিখেছেন··· 'The revenue affairs were solely in charge of Md. Razakhan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added 10 percent for 1771' (Oxford History, P. 508).

কর আদায় সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য প্রনিধান যোগ্য—

বাঙ্গলা সাল	বাঙ্গলা দেশে রাজস্ব টাকা আদায়
১১৭৫ (দুর্ভিক্ষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত)	১ ক্রোড় ৫২ লক্ষ
১১৭৬ (অল্প অল্প অজন্মা, শস্যের দাম চড়িল)	১ ,, ৩১ লক্ষ
১১৭৭ (সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ)	১ ,, ৪০ লক্ষ
১১৭৮ (প্রায় অর্দ্ধেক দেশ উজাড় চাষী নাই চাষ বন্ধ)	১ ,, ৫৭ লক্ষ

দ্র- ভূমিকা, শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

১২. অধ্যাপক রামজে মুয়র সেই সময়কে Power without responsibility—যুগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।" আনন্দমঠ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—ভূমিকা শ্রীযদুনাথ সরকার।

১৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে—'আনন্দমঠ' রচনার প্রেরণা ও পরিণাম-চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত গ্রন্থে। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৪. ফড়কে সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বই দুটি থেকে :

(a) Joshi, V. S. Vasudeo Balavant Phadke, 1959.

(b) Source Material for a History of the Freedom Movement in India, collected from Bombay Government Records V. I. এখানে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির ভূমিকা ও আলোচনা থেকে।

১৫. তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'Thinking day and night of this and thousand other miseries, my mind has been wholly bent upon the downfall of the British power in India.'

১৬. তিনি বলেছেন—"These dying people are children born of the same motherland of which I was born. That they should die of Starvation; crying for food, that this country like America should become the Colony of the British and I should earn my petty livelihood like a dog, I could not bear'.

১৭. 'The history of phadke..was a curious phenomenon—one man standing out against the mighty British Empire—, it left its legacy, and the seeds he sowed grew into a mighty banyan tree, with its shoots spread all over India, in about a quarter of a century's time. His patriotism and daring spirit were taken up by the Chapekar brothers,....and from them it was taken over by the revolutionary wing of the Indian nationalists early in the twentieth Century'. —Majumdar, R. C. British Paramountcy and Indian Renaissance, Pt. I. 1963, P. 913.

১৮. Joshi, V.S. Vasudeo Balavant Phadke 1959. P-41.

১৯. বন্দেমাতরম্‌ (sic) — বঙ্গদর্শনে ছিল :—

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"
প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"
আর কি আছে? আর কি দিব? তখন উত্তর হইল,
"তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।"

২০. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ফাড়্‌কে কে 'ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা' বলেছেন। দ্রষ্টব্য—আনন্দমঠের উৎস, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর, পূজা-সংখ্যা ১৩৭৪)। বিস্তারিত আলোচনায় অধ্যাপক মজুমদার বলেছেন—'বাসুদেবের মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদ এক আকস্মিক ঘটনা। ইংরেজ

আসলে এর পূর্বে এ ধরনের স্বাদেশিকতার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বাসুদেবের জন্য স্বাদেশিকতার উপন্যাস রূপ দিয়েছেন বঙ্কিম।'

২১. দেশপ্রেমিকদের কাছে এই উপন্যাসের মন্ত্র কি ভাবে পৌঁছোল তা বোঝা যাবে শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত উচ্ছ্বাস থেকে। তিনি লিখেছেন—'Bande Mataram. The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of Patriotism. The Mother had revealed herself. Once that vision has come to a people, there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple has been readymade, the image installed and the sacrifice offered.' The Hour of God and other writings, Vol. 17. P—347. by Sri Aurobindo.

২২. দ্র- বাসুদেব বলবন্তের আত্মজীবনী। আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩. এই উক্তির প্রমাণ আছে 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও, যেখানে মাধবাচার্য যে কোনো প্রক্রিয়ায় হেমচন্দ্রের থেকে মৃণালিনীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তাঁর ধারণা মৃণালিনী তাঁর কাজের প্রধান অন্তরায়। এই কথাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে। 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয়।...এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।' অর্থাৎ স্বদেশসেবার কাজে বাঙ্গালীর স্ত্রী সহায় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ হচ্ছে অভিমত।

২৪. গুরু—যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য...বুঝিলাম না।

গুরু—অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়' সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বর সম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি ও পরিণতি হইয়াছে।'

—বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, ধর্ম্মতত্ত্ব, পৃ-৮৪৭, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন।

২৫. 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম'। গোপাল হালদার মহাশয় বলেছেন, এই তিনটি হচ্ছে 'অনুশীলন ধর্ম্ম প্রচারের ফল'। দ্র- ভূমিকা, পৃ-২৭, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন।

২৬. বাংলা কথাসাহিত্যে দেশকে মায়ের আসনে বসিয়েছেন প্রথম ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে', (১৮৫৭) এবং একটি রূপক আখ্যায়িকা 'পুষ্পাঞ্জলিতে' (১৮৭৭)।

২৭. 'তোমার বাহসম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্মিক ধার্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার ওই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।"—কমলাকান্ত, বঙ্কিমরচনাবলী, পৃ-৬১

২৮. আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণে একথার অনেক প্রমাণ আছে। সেখানে উপন্যাস শেষ হচ্ছে এক আশার বাণী শুনিয়ে;—বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডল জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডলের দীপ, উজ্জলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।' বলা বাহুল্য সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। এমন কি 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল'—এই পংক্তির পরের উক্তিসমূহই প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

২৯. অমিয়ভূষণ বসু, 'চণ্ডীচরণ সেন'; 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ পৃ- ৯২৫

৩০. সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৮১তে; কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারীর কাজ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই এক ঘন্টার নোটিশে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

৩১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' সম্পর্কিত গ্রন্থে এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্ভিস ফাইল থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। (দ্র- সরকারী রিপোর্ট, বঙ্কিম অনুচ্ছেদ)। তাতে দেখা যাচ্ছে আনন্দমঠ প্রকাশের পূর্বে তিনি যেমন প্রায়শই প্রশংসিত, প্রকাশের পরে তেমনি প্রায়শই নিন্দিত। প্রকাশের পরে রিপোর্টসমূহে বলা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি 'too wordy'; 'apt to theorise too much'; 'at times a little eccentric' ইত্যাদি।

৩২. সোমেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক। 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র'। ১৯৬৪। তদন্তর্ভুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' পৃ-৩১।

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা : তৃতীয় পর্ব

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)

সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' (মাঘ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) 'দেবী চৌধুরাণী' প্রথমে দুই খণ্ড পর্যন্ত বের হয়। সম্পূর্ণরূপে 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে। আমরা যদি 'রাজসিংহ'-এর পুনর্লিখনকে (১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস বলে ধরে নিই তবু দেখতে পাবো যে 'দেবী চৌধুরাণী' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষতম পর্যায়ের উপন্যাস। মাঝখানে আমরা শুধু 'সীতারাম' উপন্যাসটি পাই। 'সীতারাম' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে। যদিও 'প্রচার'-এ ১২৯১ সালের প্রথম থেকেই 'সীতারাম' ধারাবাহিক ভাবে কিছুদিন বেরিয়েছিল।

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে গীতার নিষ্কামধর্মের প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে সেই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়টাতে বিশেষ রকমে ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। এই ভাবনার এক রকম চেহারা আছে 'সীতারাম'-এ। অন্যরকম চেহারা আছে 'দেবী চৌধুরাণী'তে। 'দেবী চৌধুরাণী' শুরু হয়েছিল বঙ্গদেশের সামাজিক অনাচারের এক স্পষ্ট ও নির্মম উন্মোচন দিয়ে। সেই সমাজে গ্রামীণ মাতব্বরেরা বিবাহের নিমন্ত্রণে উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে কুলটা বলে ঘোষণা করে। শ্বশুর সেখানে অপবাদ সম্পর্কে কণামাত্র অনুসন্ধান না করেই নির্দোষ গৃহবধূকে গৃহচ্যুত করে। কথায় কথায় একাধিক বিবাহ সেখানে স্বাভাবিক। বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, জমিদারি জুলুম সেখানে যেমন ঘৃণ্য তেমনি পাশবিক। এই ক্লেদাক্ত পরিবেশে দেশের দুর্দশার কথা বিবৃত করে ভবানীঠাকুর যখন দেবী চৌধুরাণীকে নিষ্কাম ধর্মমতের প্রশিক্ষণ দেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রত্যাশা জাগে যে, প্রফুল্ল তার দার্শনিক প্রজ্ঞা ও শারীরিক সুস্থতাকে দেশের কাজে, বিশেষ করে পীড়িত সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত করবে। এই প্রত্যাশা নিম্নোক্ত বাক্যালাপ থেকেও পুষ্টিলাভ করে। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লের সঙ্গে রঙ্গরাজের পরিচয় করে দিচ্ছেন। প্রথমেই ভবানীঠাকুর রঙ্গরাজকে বলেন যে তিনি একজন রাজা বা রাণীর

সন্ধানে বহুদিন আছেন। এ প্রসঙ্গে রঙ্গরাজ বলে—'রাজা, রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় নাকি হষ্টিন (Warren Hastings) বলিয়া একজন ইংরেজ ভালো রাজ্য ফাঁদিয়াছে।' একথার উত্তরে ভবানী আবার বলেন 'আমি সেরকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা তা তো তুমি জানো' (প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)। দেশের রাজা খোঁজেন না ভবানীঠাকুর। তবে কি খোঁজেন? সে কি নৈরাজ্য অবসানকারী এক শাসনকর্তা নন? যিনি দেশে মানবিক নিয়মশৃঙ্খলাও সদ্বিধি প্রচার করবেন এবং অত্যাচার ও মাৎস্যন্যায়ের অপনোদন করবেন! আমাদের এই প্রত্যাশা যে সঠিক তার প্রমাণ আছে উপন্যাসের প্রথমখণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদেও। সেখানে ভবানীঠাকুর নিজে কিরকম রাজত্ব করেন তার একটি পরিষ্কার চিত্র দিয়ে রাখেন। তিনি বলেছেন 'আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।' দুষ্ট কে? ভবানীর ব্যাখ্যানুসারে দুষ্ট ভূম্যধিকারীরা যারা শিশুর পা ধরে আছাড় মারে। যুবতীর চরমতম লাঞ্ছনা করে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়ে দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে ছেড়ে দেয়, এমনকি সিংহাসন থেকে শালগ্রাম শিলা ফেলে দেয়। এই দুরাত্মাদের থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার কথা যখন ভবানীঠাকুর দেবী চৌধুরাণীকে বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, সামাজিক ন্যায়সাধন এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের প্রধানতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের জন্যই এক অপাপবিদ্ধা, নিগৃহীতা নারীকে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়িকা করে তুলেছেন। এই জন্যেই সমাজের ভিতরে কলুষতার অপনোদনের জন্য ভবানীঠাকুর এই নারীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্খিত ধর্মশিক্ষা দিয়ে অস্ত্রের মত করে গড়ে নিয়েছেন। এইটুকু পর্যন্ত এই উপন্যাসে কোন খণ্ডতা বা স্ববিরোধ আমরা পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গদেশের সামাজিক দুরবস্থার কথা খুব ভালো করে আমাদের বুঝিয়েছেন। ইংরেজ যখন আসেনি সে যুগের অর্ধ-ডাকাত, অর্ধ-জমিদার চেহারার ভূস্বামিবৃন্দের অনাচারের খবরও তিনি যথাযথভাবেই দিয়েছেন। সেই অনাচারের প্রতিরোধকল্পে তিনি দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পর দেবী চৌধুরাণীকে নিয়োজিত করবেন এই সদিচ্ছার প্রকাশও উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। ফলে উপন্যাসের মাঝামাঝি এসে আমরা এক যুদ্ধের সম্মুখীন হলাম। যেখানে উপযুক্ত অস্ত্রে এক ব্যাধির চিকিৎসা ঘটবে। দুষ্কৃতকে বিনাশ করে ধর্মসংস্থাপন হবে। নিদেনপক্ষে একটা বড় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে। যে দ্বন্দ্বে এক তাত্ত্বিক নায়িকা এক কদর্য সমাজের সম্মুখীন হবে।

কিন্তু তা কি হয়েছে? আদপেই কি এ উপন্যাস তার পূর্বার্ধের প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বহন করতে পেরেছে? কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রফুল্ল দেবী হবার পর সমাজকে বাদ দিয়ে তার নিজের সংসারটিকে নিয়ে অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই উপন্যাসে একটি মাত্র অত্যাচারিত মানুষের উদ্ধারকল্পে দেবীচৌধুরাণীকে আমরা সচেষ্ট হতে দেখি। তিনি হরবল্লভ রায়। প্রফুল্লের নিজেরই শ্বশুর। এছাড়া অবশ্য প্রফুল্ল যুদ্ধে নির্দোষ মানুষের জীবনরক্ষার জন্য আত্মসমর্পণের কথা বলেছে। তদুপরি বনের মধ্যে সভা ডেকে নিজের সমস্ত ধনদৌলতও বিলিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে নিষ্কাম ধর্মসাধনার পর প্রফুল্লের বহু বিজ্ঞাপিত রাণীগিরি! বলা বাহুল্য শুধুমাত্র অর্থদান করে সামাজিক অন্যায় বা জমিদারের পীড়ন বন্ধ করা যায় কিনা সে এক বড় প্রশ্ন। কাঙ্খিত ছিল পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। অন্ততপক্ষে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। যে কথার আভাস আছে ভবানীঠাকুরের সেই উক্তিতে—'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন'। কিন্তু সেরকম একটি উদ্যোগেও প্রফুল্লকে এই উপন্যাসে আমরা নিযুক্ত হতে দেখি না। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে যখন প্রফুল্ল উত্তম গৃহিণী-হয়ে এমন কি হরবল্লভের স্বার্থান্ধ হৃদয় পর্যন্ত জয় করে নেন এবং 'দেবী নিবাস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের সামাজিক ঋণশোধ করেন তখন মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি পরিবারের নানারকম অত্যাচার সহ্য করেও সুগৃহিণী কিভাবে হওয়া যায় তার একটা 'ওয়ার্ক বুক' তৈরী করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। মনে হয় দেশের মানুষের দুরবস্থা, ভূস্বামীদের নৃশংসতা, নারীর জীবন নিয়ে সামাজিক যথেচ্ছাচার ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপন্যাসে না এলেও চলতো। কারণ সূচনার বিপুল বিস্তার ও গভীর প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় খণ্ড থেকে এ উপন্যাস রোমান্সে পরিণত হয়েছে। হয়ে উঠেছে নিষ্কামধর্মে দীক্ষিত এক ব্যর্থ সমাজহিতব্রতীর রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনী। এই পরিণতি থেকে মনে করা যেতে পারে যে স্বামীসেবা ছাড়া নারী জীবনের যে অন্য কোন গতি নেই ইত্যাদি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা সবাইকে আরও ভালো করে বোঝানোর জন্যে এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি বঙ্কিমচন্দ্র আবার নতুন করে লিখে নিলেই পারতেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতকালে এই উপন্যাসের দুটি সংস্করণ করা সত্ত্বেও তার প্রথম খণ্ডের কোনও গুরুতর পরিবর্তন ঘটাননি। বরং উপন্যাসের শেষে

একটি গীতার শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এবং যে কয়েকটি বাক্য সেই শ্লোকের পূর্বে সংযোজিত করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

> 'এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—
>
> "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"
>
> (বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ-৮২০)

অর্থাৎ প্রফুল্লের হাতে সাধুর পরিত্রাণ, অসাধুর বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন তিনটিই হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মনে করেছেন এবং প্রায় অবতারের কাছাকাছি কোথাও তার স্থান নির্দেশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে এ সব স্তুতি নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। হয়েছেও। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—'উপন্যাসের মধ্যে উল্লিখিত তিন কর্মের একটিরও পরিচয় নাই'।[১] প্রফুল্লের জীবনচরিত 'নিষ্কামধর্মসাধনার নিষ্ফলতাই প্রমাণ করে'।[২] একই বিষয়ে সমালোচক গোপাল হালদার মহাশয় উপসংহারের এই বক্তৃতাকে বলেছেন—'হিং টিং ছট্'। বলেছেন তত্ত্বকথাই যদি পড়তে হয় তাহলে মূল ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, প্রভৃতি পড়লেই হয়। উপন্যাস পড়ার দরকার কি?'[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল স্তুতি এবং সমালোচকদের সেই স্তুতিতে আপত্তি দুটির পিছনেই উপযুক্ত কারণ আছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকটি এ বিষয়ে খুবই অস্পষ্ট নয়। 'হিং টিং ছট' বলে এলোমেলো তুচ্ছতার বিষয় হিসেবে ব্যাপারটিকে নির্দেশ করা যায় না। তাছাড়া অন্ততঃ পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রফুল্ল দুষ্টের দমন একেবারেই না করলেও শিষ্টের স্বামীর প্রতিপালন এবং ধর্মরক্ষা কিছুটা করতে পেরেছিল। সেদিক থেকে শ্রীসেনগুপ্তের উক্তি দেশহিতের বৃহত্তর ও কাঙ্খিত পটভূমিকায় সঠিক হলেও পারিবারিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নির্মমই।

তবে উপরের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবণতার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশপ্রেমিক নারীচরিত্র নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বরাবরই একটা সমস্যা ছিল। এ প্রসঙ্গে সে সমস্যায় একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'আনন্দমঠ,' 'রাজসিংহ,' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু নারী চরিত্রকে স্বদেশ-হিতব্রতে নিয়োজিত করেছেন। এই চরিত্রসমূহের মধ্যে রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত সর্বশেষ দেশপ্রেমিক। অন্যদিকে 'আনন্দমঠে'র শান্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নারী দেশপ্রেমিক। বলা বাহুল্য 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মৃণালিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের কোনো চিহ্ন নেই। 'মৃণালিনী'তে মনোরমার মধ্যেও দেশপ্রেম নেই তবে কিছুটা দায়িত্ববোধ আছে। সে একবার পশুপতিকে বলেছে যে, 'রাজা যদি রাজ্য অপেক্ষা মহিষীকে বেশী ভালোবাসে তবে স্বৈণ রাজার রাজ্য থাকে না'। অন্যদিকে মৃণালিনীর হৃদয়বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে হেমচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলে। এ সব চরিত্রের তুলনায় 'আনন্দমঠে'র শান্তি কাজকর্মে অনেক বেশি দেশপ্রেমিক। কিন্তু সেও স্বামীর ধর্ম অনুসরণ করেই দেশের কাজে ব্রতী হয়েছে। শান্তি সত্যানন্দকে বলেছে—'আমি তাহার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিতে আসিয়াছি'। এ খুব ছোট কথা নয়। স্বামীর বহির্জীবনের কর্মের সঙ্গে স্ত্রী নিজেকে জড়িত করবেন এই আধুনিক বাসনা শান্তির উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। সে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে দেশের কাজ যে নারীরও কাজ হতে পারে এই বোধও শান্তির মাধ্যমেই আমরা প্রথম পেলাম। তবে ঐ পর্যন্তই। পতির সঙ্গে একই ধর্মাচরণের সীমা শান্তি চরিত্রে কখনো লঙ্ঘিত হয়নি। দেশহিত নয়, জীবানন্দই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর ধর্ম। সবশেষে ঐ ধর্মাচরণের জন্যই জীবানন্দকে নিয়ে হিমালয়ের উপর কুটির প্রস্তুত করে সে চিরব্রহ্মচর্য পালন করে। তবে এই তপস্যার একটি সংযোজনী আছে। শান্তি ও জীবানন্দের তপস্যার লক্ষ্য দেশমাতার মঙ্গল। তাঁরা সেই বর প্রার্থনার জন্যেই হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

শান্তি পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্র সমূহে দেশপ্রেম এবং পতিপ্রেমের কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নি। সেই দ্বন্দ্ব প্রথম দেখা গেল প্রফুল্লের ক্ষেত্রে। পতিগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং ভবানীঠাকুর কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে স্বামীগৃহের পরিধির বাইরে ধর্মাচরণের ও দেশসেবার একটি ক্ষেত্র প্রফুল্ল খুঁজে পেয়েছিল। ভবানীঠাকুর এবং নিশি দুজনেই প্রফুল্লকে দীক্ষিত করেছিল এই মন্ত্রে। শ্রীকৃষ্ণ 'স্বামীরও স্বামী'। কিন্তু এতটাও যথেষ্ট হোল না। আমরা দেখলাম অতো প্রস্তুতি ও দীক্ষার পরেও ব্রজেশ্বরকে বর্জন করে নিষ্কাম ধর্ম অবলম্বন করে সমাজ হিতব্রতে প্রবৃত্ত হওয়া প্রফুল্লের পক্ষে সম্ভব হোল না।

কেন হোল না? দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাপারে আপত্তি থাকবার কথা নয়। কারণ 'ধর্মতত্ত্ব'র উপসংহারে তিনি স্বদেশপ্রীতিকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম' বলেছেন। তেমনি নিষ্কাম ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম। এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় ও দীক্ষা এমনকি অনুশীলনও প্রফুল্লের মধ্যে ঘটেছিল। কিন্তু তারপরেও আমরা দেখলাম পাঁচ বছরের অনুশীলনেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল-র কোন লক্ষ্য পরিবর্তন হয় না। দু-একজন মানুষের জন্যে করুণাবর্ষণ ভিন্ন প্রফুল্লের অন্য কোন দেশহিত বা লোকহিতের উদ্যোগ আমরা দেখি না। তার মনপ্রাণ সর্বদাই পড়ে থাকে ব্রজেশ্বরের দিকে। সে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বার্থপর শ্বশুরের জন্যে নিজের অনুগামীদের প্রবঞ্চিত করে আত্মত্যাগ করতেও পরাঙ্মুখ নয়। বস্তুত স্বদেশ ও সমাজের হিত, নাকি স্বামী ও তাঁর পরিবারের হিত;—এই দুটির মধ্যে নারী কোনটিকে বেছে নেবে এই দ্বন্দ্ব যখন উপস্থিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নারীর জন্যে স্বামীর গৃহকোণ নির্দেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দেশপ্রেম মানুষের জীবনের পরমতম ধর্ম। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্বামীর পরিবার সেই দেশপ্রেম থেকেও বড় কাঙ্খিত বিষয়। এই অদ্ভুত লোকাচার-প্রসূত-বিশ্বাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে মুক্তি পান নি।

এখানেই শেষ নয়, এই লেখকই তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসে নারীকেই দেশপ্রেমিক পুরুষের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত করেন। তাঁর হেমচন্দ্রের উদ্দামতা স্তিমিত হয় মৃণালিণীর অমোঘ আকর্ষণে। ভবানন্দের মতো দেশপ্রেমিক কল্যাণীর রূপলাবণ্যের মোহে আত্মবিসর্জন করতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসের পরেও সীতারামের ক্ষেত্রে আমরা শ্রীকে কেন্দ্র করে একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমিক নারীদের স্বামী ভিন্ন কোনো গতি নেই। অন্যদিকে তাঁর পুরুষ দেশপ্রেমিকদের প্রধানতম শত্রু নারী। সেখানে নারীসঙ্গ মানেই সর্বনাশ। নিষ্ঠুরভাবে তাই নারীসঙ্গবর্জন করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন না করলে সেখানে পুরুষকে দিয়ে দেশহিতের কাজ হয় না। এই চরমতম দুটি ধারণার দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসসমূহ বারবার বিব্রত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের কোন সমন্বয় বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' পর্যন্ত করতে পারেন নি। এ জন্যেই দীক্ষিতা প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বরের সংসারে বাসন মাজতে পাঠানো ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কোন পথ রইলো না এবং সেই গৃহকর্মকেই ধর্মসংস্থাপন হিসেবে শেষপর্যন্ত মেনেও নিতে হোল। এভাবে দেশের ও সমাজের বিকৃতি অপনোদনের জন্যে ও দুষ্টের শাসনার্থে যে উপন্যাসের সূচনা

তার উপসংহার ঘটলো সামান্য একটি পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের মধ্যে। জলন্ত উজ্জ্বল মশাল গিয়ে গৃহকোণের বিবর্ণ প্রদীপ হয়ে পড়লো।

ফলে এই উপন্যাসের সূচনা আমাদের যে পরিমাণে উদ্দীপ্ত করে এর সমাপ্তি সেই পরিমাণেই নিরাশ করে। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রত্যাশাটি এ উপন্যাসে পূর্ণ করে তুলতে পারেন নি তা বঙ্কিমযুগের বাঙালির জীবনে খুব সহজ প্রত্যাশাও নয়। বহির্জীবনে নারী কিভাবে পুরুষের সহযোগী হয়ে উঠতে পারে তা স্থির করতে এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপর যেতে হয়েছিল 'মহুয়া' (১৯২৯) পর্যন্ত। 'পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী' বা 'মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত গীত'-কে রবীন্দ্রনাথের সেখানে বর্জন করে তবেই 'দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে'-র কথা বলতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যৌবনেই য়ুরোপ ভ্রমণের সময় পুরুষের পার্শ্বে বিদেশিনীদের দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আমলে নারীশিক্ষার প্রসারও ঘটেছে। নিজের পরিবারেও নারীজীবনের দ্রুত পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয় নি। ফলে স্বপ্নদৃষ্টিতে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন এক অগ্নিকন্যার, কিন্তু নানা সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কে যখনই তাকে পুনর্স্থাপিত করতে গেলেন তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদ হলো। সমকালীন সমাজজীবনে সেই স্বপ্নরোপণের আনুকূল্য তিনি পেলেন না।

সীতারাম (১৮৮৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এও 'দেবী চৌধুরাণী'র মতোই প্রায় একই ধরণের ঘটনাসমূহ ঘটেছে। এখানে নায়িকা শ্রী নায়ক সীতারামকে 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' এই হিন্দু-স্বাজাত্যবোধের আহ্বানে প্রথমেই উদ্বুদ্ধ করে। তারপরে বৃক্ষারূঢ়া বনদেবীর মত যখন 'মার শত্রু মার, দেবতার শত্রু মার', ইত্যাদি আহ্বানে শ্রী 'হিন্দুর রণজয়' সম্পন্ন করে তখন ভ্রাতৃস্নেহের পাশাপাশি অন্যতর একটি জাতিপ্রেমের অনুরাগও আমরা লক্ষ করি। শেষ পর্যন্ত এই শ্রী জয়ন্তীর কাছে দীক্ষিত হয়ে মহাপুরুষের মন্ত্রপূত ত্রিশূল নিয়ে যখন সীতারামের রাজ্যে এসে রাজার হিতসাধনের বদলে রাজ্যের দুর্বিপাক সৃষ্টি করে তখন আমরা আবার সেই পুরনো সূত্রেই ফিরে যেতে

বাধ্য হই। তবে এখানে ঐ পুরোনো সূত্রের সঙ্গে আরো একটি পুরোনো বঙ্কিমী সংস্কার পুনর্ব্যবহৃত হয়। আমরা আবার দেখি বঙ্কিমের রচনায় নারী তা তিনি 'কুলটা'ই হোন বা সন্ন্যাসিনীই হোন পুরুষচিত্তে বিভ্রম এবং বিরংসা ছাড়া কিছু জাগাতে পারেন না। এই উপন্যাসে সন্ন্যাসিনী শ্রীর সঙ্গে সীতারাম দীর্ঘকাল পৃথক আসনে বসে বাক্যালাপ করেছে। সেই বাক্যালাপের ফলে কামনার এক অপ্রতিরোধ্য দাহ ছাড়া সীতারামের চিত্তে অন্য কোন ভাবের জাগরণ হয়নি। এখানেও শ্রীর জন্যে সীতারামের দেশের কাজের সর্বনাশ হয়। অনুশীলন ধর্ম 'দেবী চৌধুরাণী'তে সঙ্কুচিত হয়েছিল নারীকে পতিগৃহে ঠেলে পাঠানোর লৌকিক প্রেরণার কাছে। এখানে ব্যর্থ হলো পুরুষের অপ্রতিরোধ্য কামনাবহ্নির কাছে।

এ সব থেকে মনে হতে পারে যে পতিসঙ্গ বর্জন করে নারীরা বিশুদ্ধ নিষ্কামধর্ম পালন করুণ এও বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল না। কারণ প্রফুল্লকেও পুত্রপৌত্রাদি রেখেই মরতে হয়েছিল শ্রীকেও স্বামীর নর্মসহচরী হতে রাজি হতে হল। বস্তুত এজন্যেই প্রথম থেকেই সীতারামকে বাদ দিয়ে শ্রীর ধর্মকর্ম অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-পুরুষের সম্পর্কে ব্রহ্মচর্য, অনুশীলন ধর্ম, উদ্দাম কামনা, পুনরায় ব্রহ্মচর্য এই বিচিত্র বিভ্রম থেকে পথ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। তাঁর রচনায় একমাত্র তদ্গতভাবের শান্তি-জীবানন্দ ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষ-নারী সম্মিলিতভাবে কোন মহৎকর্মে নিয়োজিত হতে পারেন না। একজন অন্যজনকে আদর্শচ্যুত করে ফেলেন। শুধুমাত্র 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহের সম্পর্কটি অন্যরকম। অন্যরকম হয়তো একারণেই যে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক কোনো নৈকট্যই সেখানে গড়ে ওঠে নি। তাই মনে হয় প্রেম ও দাম্পত্যকে দেশপ্রেমের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলভাবে দেখবার মতো কল্পনাশক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এইসব উপন্যাস লিখেছেন তখনও বাঙালি জীবনে আঙিনার বাইরের গঠনকর্মে নারীর ভূমিকা শুরুও হয় নি। এমন কি গৃহের বাইরের নারীজীবন তখনো প্রায়শই অবারিত। দেশে তখনও শতকরা একজন নারীও সাক্ষর ছিলেন না। তাই গৃহের বাইরে নারীর কোনো বড় সৃজনকর্ম বঙ্গসমাজে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে যান নি। নারী তখনো গৃহলক্ষ্মীই। এ জন্যেই হয়তো বারবার তাঁর উপন্যাসে বলদৃপ্ত নারীরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত জীবনচর্যা থেকে স্বামীর আশ্রয়ে

ফিরে আসেন। লেখক তাঁদের জন্যে উচ্চতম লক্ষ্য নির্ধারণ করে উপন্যাসের সূচনা করেন কিন্তু শেষপর্যন্ত নারীদের গতি হয় গৃহকোণেই।

এছাড়াও 'সীতারাম' উপন্যাসের একটি অন্যদিকও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর যুগ থেকেই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা বিজয় কাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সীতারামে এসে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে প্রথম হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে পেলাম। এ রাজা অবশ্য স্বাধীন নন, তাঁকে দিল্লীর বাদশাকে কর দিতে হয়। এহেন সীতারামের রাজত্বও কেন ধ্বংস হোল সেই কারণটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠকের কাছে মোটেই নতুন নয়। যে জন্যে দেবেন্দ্রের জীবনের সর্বনাশ হয়েছে, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস হয়েছে, ভবানন্দ আত্মাহুতি দিয়েছে, ফষ্টর, মবারক প্রভৃতি চরিত্রের যে পরিণতি, সীতারামেও সেই একই অন্ধ রূপমোহজনিত বিনাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে সামাজিক উপন্যাসের রূপমোহ আর সীতারামের রূপমোহের মধ্যে পার্থক্য আছে। সীতারাম শুরু হয়েছিল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। নায়ক সীতারাম সেই লক্ষ্যে পরিকল্পিত ভাবে অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু রূপমোহে তার পদস্খলন হলো। প্রশ্ন উঠবে কেন আবার রূপমোহ? একি বঙ্কিমের পুরোনো সেই মুদ্রাদোষ? নাকি অন্য কোনো বক্তব্য এই মোহ-বিরংসা ও উদ্দাম ভোগের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে? আমরা মনে করি ঐ মুদ্রাদোষ ছাড়াও একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে পরিষ্কার করে বলেছেন এবং বঙ্কিচন্দ্রের হিন্দুরাজ্য সম্পর্কে ধারণা বা মুসলিমবিদ্বেষ সম্পর্কিত চালু মত সমূহের পুনর্বিচার এই উপন্যাস থেকেই শুরু হতে পারে। কারণ যে বঙ্কিমের অভিমুখে সাম্প্রদায়িকতার কর্দম প্রতি মুহূর্তে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, একধরণের সমালোচকের কাছে যিনি মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উপন্যাসটি কিন্তু তাঁর সাম্প্রদায়িকতার যে সুনাম (!) তার বিশেষ ক্ষতিই করে। এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ আলোচনা আমরা করেছি সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত-পরিচ্ছেদে। এখানে বলতে পারি, উগ্র মুসলমানদের হাতে একসময় যেমন আনন্দমঠের বহ্নিউৎসব হয়েছে তেমনি কখনো কোনো উগ্র হিন্দুর দল যদি সীতারামের বহ্নিউৎসব করে তবে অবাক হবার মতো হেতু নেই। কারণ এই উপন্যাসে একজন রাজা এক হিন্দু সন্ন্যাসিনীকে জনসমক্ষে বিবস্ত্র করে বেত্রাঘাত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। এই উপন্যাসে

এক হিন্দু রাজা নগরীর অন্তঃপুর থেকে সুন্দরী নারীদের বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে এসে তাদের উপর অত্যাচার করেছেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস সমূহের মধ্যে এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রের মধ্যে সব থেকে বেশি অত্যাচার, অনাচার ও অধর্মাচরণ করেছে সীতারাম। সেজন্যে সীতারামের রাজ্য থেকে চাঁদশাহ ফকির এই বলে প্রস্থান করে—'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না।'

যে উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ঘোষণা করে, সে উপন্যাসের পরিণতি যদি ট্র্যাজিক হোত, যদি দেখা যেত যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা হোল না, তবে হিন্দুবঙ্কিমের (!) হিন্দু স্বাদেশিকতার বিষয়টি বোঝা যেত। কিন্তু এই উপন্যাসে হিন্দুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল, কিন্তু সে রাজত্বের প্রতি লেখক হিন্দুমমত্ববোধ না দেখিয়ে পাঠকদের মনে বরং সেই রাজত্বের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব গড়ে তুললেন। কেন তুললেন তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। বলেছেন সীতারামের ধর্ম ছিল না, অর্থাৎ শুধুমাত্র হিন্দু হলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্মরক্ষা হয় না। এই উপন্যাসে যতক্ষণ সীতারামের ধর্মে মতি ছিল ততক্ষণ চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে সীতারামের কোন মতান্তর হয়নি। সেই মতান্তর তখনি ঘটলো যখন সীতারাম তার পালনীয় মানবধর্মের সীমা লঙ্ঘন করলো।

রাজসিংহ উপন্যাসের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,—

> 'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করতে হয় যে যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই নিকৃষ্ট।'

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে সুদীর্ঘকাল নানামুখী চিন্তার পর, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। শুধুমাত্র হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলেই দেশের সমস্যার বিমোচন হয় না। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা মানেই ভারতের

শান্তির সূচনা এরকম আজগুবি বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের যেমন ধর্মচিন্তার সূচনা হয়েছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেষ্টন থেকে ;—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেমন উদার মানবধর্মের জগতে নিজের উত্তরণ ঘটাতে পেরেছিলেন : তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ধর্মজিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল নাস্তিকতা থেকে ;—তারপরে হিন্দুস্বাজাত্যবোধ হয়ে তিনিও পৌঁছেছিলেন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাহীন এক উদার মতবাদের কাছাকাছি। এই মতবাদের প্রমাণ আছে 'সীতারাম' উপন্যাসে সর্বত্র। আছে তার বর্জিত অংশ সমূহেও। জাতি সম্মেলনের এই ধারণায় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন বলেই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সীতারামের ঐ রকম নির্মম সমালোচনা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

রাজসিংহ (১৮৮২ এবং ১৮৯৩)

'রাজসিংহ' উপন্যাসের শেষ (চতুর্থ) সংস্করণ আকারে প্রথম সংস্করণের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বড়। এই বৃহৎ-আকারে প্রায়-নতুন উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন তাঁর মৃত্যুর আগের বছর। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাথমিক তিনটি সংস্করণ ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। এই উপন্যাস রচনার আগে বঙ্কিমচন্দ্র সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম করে 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনারও ইতিহাস আছে। কিশোর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র একবার হলধর তর্ক চূড়ামণিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ষোল শ গোপিনী এবং বস্ত্রহরণ লীলা এ সব অশ্রদ্ধেয় কাহিনী কেন ?[১] এ জিজ্ঞাসার সমাধান আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে। পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। বুঝেছিলেন গোপীলীলা প্রক্ষিপ্ত। তেমনি 'রাজসিংহ' উপন্যাসেরও পূর্বসূচনা আছে। কিশোর বয়সে না হলেও উত্তরতিরিশ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দেখি আদর্শ হিন্দুবীরের সন্ধানে ব্যাপৃত হতে। হেমচন্দ্রে সে সন্ধান তৃপ্ত হয়নি, সত্যানন্দে সে সন্ধান অসম্পূর্ণ, সীতারামে ব্যর্থ। এই সমস্ত খোঁজাখুঁজির নানা বিচিত্র সূত্রকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে এসে আমরা সম্মিলিত হতে দেখি। এতদিনের বীরসন্ধানের প্রক্রিয়া রাজসিংহে এসে যেন একটা উপযুক্ত আশ্রয় পেলো। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দীর্ঘদিন পরে এ উপন্যাস অনেক দীর্ঘায়িত করে লিখতে হলো। বস্তুত কৃষ্ণচরিত্র লিখবার আগে এই উপন্যাস দীর্ঘাকারে

লেখা হয়তো সম্ভবও ছিল না আবার অন্যদিকে কৃষ্ণচরিত্র লিখবার পর এ উপন্যাস না লিখেও বঙ্কিমচন্দ্রের বোধকরি উপায় ছিল না।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের-ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন মতামত আছে।[৫] সে সমস্ত মতের নানা গুরুত্বও আছে। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় উপন্যাসের মধ্যে এই আদর্শ চরিত্র অন্বেষণের ঝোঁকটি। এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের যে বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে সে সম্পর্কে তিনি 'রাজসিংহ' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনেই লিখেছেন যে,—

> 'ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব নহে, উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাহুবলের অভাব দেখা যায় সত্য কিন্তু তাহার কারণ হইল পরাধীনতা। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র এছাড়াও বলেছেন যে হিন্দুদের বাহুবলই তাঁর প্রতিপাদ্য। এই হেতু তিনি 'রাজসিংহ'কে নির্বাচন করেছেন।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি শিশোদিয়া রাজবংশের অন্যতম বীর ও মেবারের সুবিখ্যাত নায়ক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে গ্রীক ইতিহাসের লিওনিডাস, থেমিসটোক্লেস এবং পালিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য ওলন্দাজ বীর মুকাথ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।'[৭]

তাছাড়াও তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। গর্বিত ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের নেই। এ জন্যেই ইতিহাসের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। এ চিন্তা তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করতো।[৮] সেই সঙ্গে ঐতিহাসিকের কলমে যেখানে ইতিহাস নেই সাহিত্যিকের সত্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষা থেকে ইতিহাসের এক সৃজনমূলক উন্মোচনের বাসনা সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদাই তাড়িয়ে রাখতো। মনে করা যেতে পারে যে এ জাতীয় প্রবণতা তিনি পেয়ে থাকবেন শেক্সপীয়র থেকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই প্রবণতাটি বঙ্কিমের একেবারে নিজস্ব।

সে জন্যেই বাংলার ইতিহাস, 'বাঙালির বাহুবল' 'ভারতের স্বাধীনতা—পরাধীনতা' নিয়ে তিনি এতো প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সব প্রেরণার উৎস তাঁর স্বদেশপ্রেম। কিছুটা জাতিপ্রেমও। এ জন্যেই ইতিহাস না থাকার পীড়াকে সুযোগ্যকল্পনা দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন। এবং কিছুটা এই হেতুতেই তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। যেমন তুর্কীর বিজয় নিয়ে 'মৃণালিনী', মোগলের বিজয় নিয়ে 'দুর্গেশনন্দিনী', ইংরেজের বিজয় নিয়ে 'আনন্দমঠ', মোগলপতনের কাল নিয়ে 'সীতারাম'। গভীর স্বদেশপ্রীতি বশতঃই তাঁর এই অতীতচারিতা। বারবার তিনি অতীত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে ইতিহাসকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিজ দেশের শৌর্যবীর্যের পরিচয় জ্ঞাপক উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এ প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিকের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে অল্প তথ্য অবলম্বন করে ইতিহাসের জমিতে কল্পনাকে পূর্ণ স্বাধীনতায় বিচরণ করতে দেওয়াকে তাঁর বিপত্তিকর মনে হতে পারে। যেমন রাজসিংহের সৈন্যকর্তৃক ঔরংজেবকে রন্ধ্রপথে অবরুদ্ধ করার ঘটনাকে আচার্য যদুনাথ সরকার অসত্য বলেছেন। আচার্য যদুনাথের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র টডের ইতিহাসে এই তথ্য পেয়েছিলেন। আচার্য যদুনাথ লিখেছেন—'টডের এই বিবরণ সত্য নহে।'[২ক] আবার তাঁর (যদুনাথের) ঐ উক্তিরও প্রতিবাদ হতে পারে।[২খ] তবে রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক সত্যে'র প্রসঙ্গের অবতারণা করে বিষয়টির একটি নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা অন্যত্র বলেছেন Gothe ও। তিনি প্রাচীন গ্রীকদের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—The Greeks were so great that they regarded finelity to historical facts less than the treatment of them by the poet (Conversation of Gothe with Eckermann—Everyman's Library Edition. P. 166.)

রবীন্দ্রনাথও কাছাকাছি কথাই বলেছেন। তাই সাহিত্যের দিক থেকে অন্তত এ প্রক্রিয়ায় আপত্তিকর কিছু নেই। একমাত্র দু-একটি তথ্য নিয়ে কিছু তথ্যপ্রেমিকের এ উপন্যাসের কোনো প্রান্তে দু-একটি শুদ্ধিপত্রের প্রয়োজন হতে পারে। তবে সেই শোধনক্রিয়ার বিশেষ কোনো সাহিত্যিক তাৎপর্য নেই। তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সাহিত্যে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নয়।

বস্তুত এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন একজন ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রয়োজন ছিল যিনি ধার্মিক ও বিজয়ী। ইতিহাসচর্চার অভিজ্ঞতায় এরকম তিনজন নরপতির নাম বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। তাঁরা যথাক্রমে শিবাজী, রাজসিংহ ও রণজিৎ সিং। তিনি এই উপন্যাসে 'রাজসিংহ'কে গ্রহণ করেছেন। কারণ,—

> 'অন্যান্য রাজকীয় গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সেই শ্রেষ্ঠ। ......রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোঘল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন'।[১০]

এবং রাজসিংহের ঐতিহাসিক প্রতিনায়করূপে তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন ঔরংজেবকে। যিনি বঙ্কিমের মতে অন্যান্য রাজগুণে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মশূন্য।

> 'ঔরংজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।'[১১]

মনে হয় ধর্ম এবং অধর্মের এই দ্বন্দ্বের বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। সেজন্যেই কিছুটা ঔরঙ্গজেবের জন্যেও বোধকরি রাজসিংহ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই ধর্ম অধর্মের সূত্রে না হলেও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের সূত্রে এই উপন্যাসের স্বাদেশিকতার একটি অন্য মাত্রা উদ্‌ঘাটিত হয়। 'আনন্দমঠ' ও অন্য দু-এক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সম্পর্কে নানা অপ্রিয় উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। তা নিয়ে সমালোচকদের তো বটেই সাধারণ পাঠকদেরও অস্বস্তি হয়। এ রকম ক্ষেত্রে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী চঞ্চলকুমারীর সেই ছবিভাঙা পদাঘাতের কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এ তথ্য কোন্ ইতিহাসের পুস্তকে পেয়েছেন ?[১২] সাম্প্রদায়িকতার এই অভিযোগের সামনে ইতিহাস ও উপন্যাসের সীমানা নিয়ে আমরা যখন কিছুটা বিব্রত হই তখন অন্য আলোচক আহমদ শরীফের কথায় সামান্য আলোকসংকেতও মেলে। অধ্যাপক শরীফ বলেন এ লাথি 'জাতি বিদ্বেষ নয়, স্ব-কালীন শাসক বিদ্বেষ'।[১৩] তবে সতেরো বছরের নায়িকা চঞ্চলকুমারী যখন ভারতসম্রাট ঔরংজেবের ছবি পদাঘাতে চূর্ণ করে পরক্ষণেই উত্তীর্ণযৌবন রাজসিংহের ছবিকে লুকিয়ে বারবার দেখে তখন সেই তীব্র বিদ্বেষ ও অদ্ভুত আকর্ষণের পেছনে প্রণয় বা বিরাগ নয়, অন্যতর কোনো আগ্রহের

সূচনা যেন আমরা অনুভব করি। প্রশ্ন জাগে এ অনুরাগে স্বদেশ এবং স্বজাতির বীরত্বের প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধা কি মেশানো নেই? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের ছবি দেখে অনুরাগ সঞ্চারের কারণ কি হতে পারে তা বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে অনুমান করেছেন—

> 'অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবি ছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তারপর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর।'

শেষ বাক্যটির এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতের অনুসরণ করে চঞ্চলকুমারীর কোন্ মনগড়া জিনিসের স্বপ্নরূপ রাজসিংহ তা আমরা বুঝতে পারি চঞ্চলকুমারীর পত্র থেকে। সেখানে তিনি রাজসিংহকে রাণা প্রতাপ, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও শিবাজীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বীর্যপ্রকাশ করার জন্য আহ্বান করেছেন। রাজপুত জাতির মধ্যে যুবকের অভাব নেই কিন্তু চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ কেন প্রৌঢ় রাজসিংহের উদ্দেশ্যেই প্রবাহিত হয় তারও স্পষ্ট উল্লেখ পত্রে আছে। চঞ্চলকুমারী লিখেছে—

> 'আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিত কলেবর। কেবল আপনিই রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন।'

সপ্তদশী তরুণী এ কারণেই উত্তীর্ণযৌবন রাজাকে বিবাহপ্রস্তাব পাঠায়। একদিকে স্বাধীনতা, বীরত্ব, ও স্বজাতিপ্রিয়তা, অন্যদিকে অত্যাচারী বাদশাহের প্রতি বিরাগ চঞ্চলকুমারীর মনে একসাথে এসে মিশেছে। তাই স্বপ্নরূপের প্রতিমূর্তিকেই চঞ্চলকুমারী ধ্যান করেছে। এ ভাবে ঐ পদাঘাতের একটি বৃহত্তর তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে। বিষয়টি যে নিতান্ত রাজকুমারীর ছেলেমানুষী নয় এমনকি শুধুমাত্র স্বকালীন শাসকবিদ্বেষ নয় তার সঙ্গে যে অন্যান্য নানারকমের অনুরাগ ও ঘৃণা চঞ্চলকুমারীর মধ্যে মিশে ছিল তা আমরা চঞ্চলকুমারী যখন আবার যুযুধান রাজপুত ও মোঘল সৈন্যের মাঝখানে এসে রাজপুতের জীবনরক্ষার্থে দাঁড়ায় তখন আবার বুঝতে পারি। বহু সার্থকরচিত চরিত্রের ভিড়ে এবং নানা ঘটনার তীব্রতায় রাজসিংহ উপন্যাসে

চঞ্চলকুমারী প্রায় প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে অল্প দু-একটি মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের এক তীব্র সুর বেঁধে দিয়েছিলেন। এই সুরটি রাজসিংহ উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার অন্তরালবর্তী প্রধান সুর। এই সুর অবলম্বন করেই আমরা বুঝতে পারি এ উপন্যাসে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, হিন্দুর বীরত্ব, শাসক শ্রেণীর অধর্ম প্রভৃতি সমস্ত কিছুরই একটি একমুখীন রূপায়ণ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উপসংহারে বলেছেন—

> 'রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মুগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবুন্নিসা ও নির্মল-কুমারীর তুলনায়, মানিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়।'

অর্থাৎ এই উপন্যাসে আমরা দুটি দৃষ্টান্তের (মডেলের) দ্বন্দ্ব দেখি। একটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের ও দেশপ্রেমের সম্মিলিত মডেল। সে মডেলের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারী। পার্শ্বচরিত্র নির্মলকুমারী ও মানিকলাল। অন্য মডেলটি অধর্মের ও পররাজ্য আক্রমণকারীর সম্মিলিত মডেল। তার কেন্দ্রীয় চরিত্র ঔরংজেব। সেই ধর্মহীন জীবনচর্যার অন্যান্য মানুষ হচ্ছেন জেবুন্নিসা ও মবারক। এবং হয়তো এক অর্থে দরিয়া বিবিও। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এই উপন্যাসকে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের বিজয় এবং অধর্মের পরাজয় দেখিয়েছেন। ইউরোপের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন ঔরংজেবের অধর্মই মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এই ব্যাখ্যায় আজকের ঐতিহাসিকের আপত্তি হতে পারে, এই ব্যাখ্যা ভুলও হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই বিষয়টি বুঝেছিলেন। এভাবেই কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

ফলে এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সারাজীবনের অমীমাংসিত একটি দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়। তাতে সাম্প্রদায়িক ঔচিত্যের সীমা তিনি লঙ্ঘন করেছেন কিনা সে প্রশ্ন আমরা একটি পৃথক পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। তবে এখানে বলা প্রয়োজন, দেশপ্রেমের সঙ্গেও দেশের ভালোমন্দের সঙ্গে ধর্মের বিষয়টিকে যোগ করার চেষ্টা 'মৃণালিনী' ও 'আনন্দমঠ' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বারবার করেছেন। 'মৃণালিনী'তে এই চেষ্টা কোন গভীর রূপ লাভ করেনি।

'আনন্দমঠে' দেশপ্রেম ব্যক্তিগত নানারকম প্রবণতার কাছে পরাস্ত হয়েছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ধর্মকে এনে ধর্ম এবং কর্মের মধ্যে যে সংযোগের সূচনা ঘটালেন রাজসিংহ উপন্যাসে তারই অনেক পরিশীলিত ও সক্ষম রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই। মনে হয় 'কৃষ্ণচরিত্র'ই এই উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য নিজের সমস্ত বীরত্ব ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করা যে একটি পরম ধর্ম এবং সেই ধর্মাচরণের ফলে বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী 'রাজসিংহ' উপন্যাসে এই বোধে বঙ্কিমচন্দ্র উপনীত হয়েছেন। ফলে সারা-জীবনব্যাপী বঙ্কিমচন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্বেষার তৃপ্তিকর পরিসমাপ্তি ঘটলো এই উপন্যাসে।

পঞ্চম অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ-১৭০
২. বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ-১৭০
৩. বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ—সাক্ষরতা প্রকাশন, উপন্যাস খণ্ডের ভূমিকা, পৃ-২২
৪. দ্র- বঙ্কিমচন্দ্র—মণি বাগচী, পৃ-৪২
৫. বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন—'এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।' সমালোচক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে—'ঔরংজেবের চিত্রে এবং রাজপুত-যুদ্ধের কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবী মিটাইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ রূপকথার মত মনে হয়।' (বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ-১৪৮) রবীন্দ্রনাথের অবশ্য 'রাজসিংহ' সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশস্তিমূলক আলোচনা আছে। দ্র- 'রাজসিংহ' প্রবন্ধ, আধুনিক সাহিত্য।
৬. 'রাজসিংহ' উপন্যাস—সপ্তম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ-১০১
৭. 'রাজসিংহ' উপন্যাস—সপ্তম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ-১২১
৮. এই যন্ত্রণার পীড়াকে কল্পনাশক্তির ব্যবহারে তিনি প্রায় ইতিহাস সৃজনকর্মে পরিণত করতে পেরেছিলেন। T. S. Eliot শেকসপীয়র সম্পর্কে বলেছিলেন—Shakespeare acquired more essential history from Plutarch than most men could from the whole British museum. (Selected Essays P—27) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন যদুনাথ সরকার—বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এমন পদার্থ আছে যাহা 'পাথুরে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায় না—সেটি সে যুগের প্রাণ' (আনন্দমঠের ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শতবার্ষিকী সংস্করণ)।
৯. (ক) দ্র- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণের যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা।
৯. (খ) Manuci-র গ্রন্থে (Stori-do-Mogor, দ্বিতীয় খণ্ড, Campaign in Udipur, P-241, Irvine অনূদিত) ঔরঙ্গজেবের বন্দীদশার ও একদিন অনাহারে থাকবার বর্ণনা আছে। Manuci নিজে বাদশাহজাদা শাহ আলমের সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। বর্ণনাটি এইরকম :—'With this design the Rana barred the roads in such a way that the Moguls, being now surrounded by mountains, could find no exit, nor know they where to pass; for the roads are provided with labyrinths and none but the natives knew the right road. Aurangazeb was amazed at

finding himself by one stroke thus encircled, unable to move either forward or backward. He knew like-wise that if the Rana up to that time had made no movement against his person, it was not because he could not, but because he would not. Still more was he alarmed when he found that his beloved Udepuri put in no appearance ; nor was there the slightest news of her. Neither was there word of any supplies. The Rana, to show that he did not want to fight, sent him supplies from his own country. He allowed him to suffer hunger for one day, so that hunger may inspire him with good sense. Thus Aurangzeb as well as his army had to content himself with a little Kichri, that is, rice and lentils cooked with a little butter''.

(দ্র- বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-শ্রীশিবানন্দ, রাজসিংহ, পৃ-৩৭৬)

১০. 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহার—গ্রন্থকারের নিবেদন।

১১. ঐ

১২. দ্র- তুলনামূলক সমালোচনা, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' প্রবন্ধ।

১৩. দ্র- প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, বঙ্কিম—বীক্ষা : অন্য নিরিখে। আহমদ শরীফ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রবন্ধে স্বদেশচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল এপ্রিল ১৮৭২ থেকে মার্চ ১৮৭৬ পর্যন্ত। ১৮৭৭ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় আবার 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছে প্রায় নয় বৎসর ধরে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়েছে প্রধানতঃ 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকায়। ১৮৭২—৯১ সাল এই সুদীর্ঘ বিংশতি বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ের প্রবন্ধরচনা করেছেন। তবে এর একটা স্পষ্ট সীমারেখা করা যেতে পারে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও প্রচারে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। বঙ্গদর্শনে দেশের সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও জনজীবন অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই অগ্রাধিকারের অন্তর্নিহিত হেতুর বিষয়টি আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছে দেশের ধর্ম এবং ধর্মদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ-সমূহের কোন শ্রেণীবিভাগ করে যান নি। তবে পরবর্তীকালে অনেকেই বঙ্কিমপ্রবন্ধসমূহের একটি শ্রেণীবিভাজন করেছেন। যেমন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের জন্য বঙ্কিম রচিত প্রবন্ধাবলীর নিম্ন-লিখিত শ্রেণীবিভাগ করেন।

(১) সাহিত্য, (২) প্রত্নতত্ত্ব, (৩) ইতিহাস ও অর্থনীতি, (৪) দর্শন ও ধর্ম এবং (৫) বিবিধ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র প্রবন্ধসাহিত্য আমাদের আলোচ্য। কিন্তু আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে স্বদেশচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধের অন্তত অর্ধেক প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশচিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বদেশচিন্তার নানান দিক সেইসব প্রবন্ধে এসেছে। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই প্রবন্ধাবলীকে তিনটি সাধারণ ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। ভাগগুলি যথাক্রমে—

(১) স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ, (২) দেশের সাধারণ মানুষ ও লোকহিত বিষয়ক প্রবন্ধ এবং (৩) মানবসমাজ ও সাম্যমত বিষয়ক প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শনের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপকভাবে প্রবন্ধরচনায় প্রবৃত্ত হন। এ জন্যে

বঙ্গদর্শনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তারপর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে নিমগ্ন হতে চাই।

॥ দুই ॥

বঙ্গদর্শনের লক্ষ্য ও লোকশিক্ষা

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পরিকল্পিত হয়েছিল। সেইজন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের দুই শ্রেষ্ঠ লেখক মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরকে সে কাগজে লিখতে অনুরোধ করেন নি।[১]

বিদ্যাসাগর বা মধুসূদন কেন আহূত হন নি, বা ওঁরাও কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বঙ্গদর্শনে লিখতে গেলেন না এ সব অনুমান মেশানো জিজ্ঞাসার সুরাহা করা আজ কিছুটা দুরূহ নিশ্চয়ই। তবে বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই উদ্দেশ্যসমূহের পরিমাপ করা হলে ঐ জিজ্ঞাসার কিছুটা অন্তত নিবৃত্তি হয়। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই উদ্দেশ্যের বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা লিখেছিলেন। তাঁর অভিমত—

'বঙ্গদর্শনই সর্বপ্রথমে ইংরাজ বাংলার যে ইতিহাস গড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটা সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাংলার চরিত্র ও সাধনার যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় বিস্তর আছে, একথাটা প্রচার করে।'[২]

এই উক্তি যথার্থ। এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অন্যতম 'মিশন' ছিল আমাদের অলিখিত ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করা। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' যে শুধুমাত্র এইটুকুই করেছিল তাও নয়। এর বাইরেও 'বঙ্গদর্শনের' নানা রকমের ব্যাপ্তি ছিল। একদল নতুন লেখকের সফল প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা, সামাজিক ভাবনা, সামাজিক ব্যঙ্গ, সর্বোপরি একটি বিশেষ রকমের ধর্মীয় দর্শন প্রবর্তনের প্রাথমিক চেষ্টাও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এই সমস্তটা মিলে যে সুর সমন্বয়; লক্ষ্য ও কল্পনার যে একমুখীনতা, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তার একটি বিশেষ তাৎপর্যও ছিল। সেই কথা বঙ্গদর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পরিষ্কার করে বলেওছেন।

হয়তো এ সব উদ্দেশের সহায়তার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু সমমনোভাবাপন্ন লেখককে বেছে নিতে হয়েছিল[৩], কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছিল।

এই নানা বিষয়সমূহের গ্রহণ-বর্জন—ক্রিয়ার মধ্যে স্বদেশচিন্তার স্থান কোথায় তা বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি স্পষ্ট করেই বলেছেন তাঁর 'বঙ্গদর্শনের' পত্রসূচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যাঁরা বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র প্রচার করেন তাঁরা বিশেষ 'দুরদৃষ্ট'। কারণ সুশিক্ষিত বাঙালিরা যেহেতু বাংলা রচনা পড়েন না সেজন্যে সুশিক্ষিত লেখকরাও বাংলায় কিছু লেখেন না। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রসূচনায় বলেছেন অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ হয়তো 'অপাঠ্য' নয়তো 'ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র'। নইলে বিদ্যাবুদ্ধিহীন লিপিকৌশলশূন্য ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। এটুকুর পরে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা হয় যে এই অভাব নিবৃত্তির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পরিকল্পনা করে থাকবেন। কিন্তু দেখতে পাই শুধুমাত্র তাও নয়। বহরমপুর থেকে ছুটি নিয়ে কাঁঠালপাড়ায় এসে তিনি কেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করলেন তার কারণ কিন্তু শুধুমাত্র বঙ্গভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি নয়, বঙ্গদেশের উচ্চশিক্ষিত মানুষরা বঙ্গভাষায় পড়বার মতো কিছু পান না, এই অভাব দূর করার জন্যেও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সূচনা করেন নি। তিনি বঙ্গদর্শনের প্রচার এবং মাতৃভাষায় উচ্চচিন্তা প্রকাশের বিষয়টি বুঝেছিলেন একেবারে অন্যতর একটি দিক থেকে। পত্র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা স্পষ্ট করেই লিখেছেন—

> 'আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছু মাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্ররা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে।'

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন এই সহৃদয়তার অভাবই দেশ উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক।[৪] তিনি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে উদাহরণ চয়ন করে দেখিয়েছেন রোম, এথেন্স, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই সহৃদয়তা ছিল বলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর ও ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ ছিল বলে—

'স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল, ফ্রান্সে পার্থক্যহেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয় অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম যাজকদিগের পার্থক্য হেতুক অকালে সমাজোন্নতিলোপ।'

তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বর্ণভেদ এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থাভেদের কুফলের কথাও এ প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য মানুষে মানুষে বিভেদ বজায় রেখে দেশের সমৃদ্ধি হয় না। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে যে রামমোহনও প্রায় একই কথা লিখেছিলেন প্রেস বিলের প্রসঙ্গে। আমরা দেখেছি সেই সমস্ত কথার পেছনে ছিল ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিশ্লেষণ ও ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত। সেই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের অবস্থাভেদ নিয়ে আমাদের এদেশে যে সমস্ত ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল তারও প্রভাব।

আমাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে মানুষে মানুষে ঐ পার্থক্যের কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'ভাষাভেদ'। 'সুশিক্ষিত বাঙালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙালী তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না।'—এই কারণ চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রকাশের বিষয়ে আমাদের একটা অপ্রত্যাশিত দিকে নিয়ে যান। অপ্রত্যাশিত কারণ, বঙ্গসাহিত্যের জন্যে নানা লেখকের রচনা প্রকাশের প্রয়োজনে এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জন্যেও সেযুগে একটি উচ্চস্তরের সাহিত্যপত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন একবারও সাহিত্যরচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না, বিপিনচন্দ্র কথিত এবং নিজের প্রিয় বিষয় ইতিহাসের কথাও উত্থাপন করেন না। তার বদলে তিনি যখন লোকশিক্ষার বিষয়টিকে এবং শিক্ষিত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাববিনিময়ের প্রসঙ্গটিকে পুরোবর্তী করে রাখেন, তখন 'বঙ্গদর্শন' পরিকল্পনার এক বৃহত্তর তাৎপর্য আমাদের সামনে পরিষ্কার হতে থাকে।[৫] এই লেখক তাঁর শেষজীবনে 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি' নিবেদন করেছিলেন—'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'[৬] এই উক্তির তাৎপর্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবনের সমস্ত সাহিত্যকর্মেই আমরা বারবার অনুভব করতে পারি। এখানে দেখছি সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন তখন তাও মুখ্যত

মানুষের মঙ্গলসাধনের জন্যেই। শুধুমাত্র সাহিত্যরচনা ও 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য নয়। এই উদ্দেশ্য নির্বাচন থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে দেশহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রধান আকাজ্ঞা ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রকাশও সেই আকাঙ্ক্ষারই পরিপূরণার্থে। শুধু বঙ্গদর্শনই বা কেন, এই লেখকের সাহিত্যজীবনেরই লক্ষ্যই হয়তো তা। এই কথাটি পরবর্তী আলোচনাতেও দু-একবার আমাদের মনে করতে হবে।

॥ তিন ॥

স্বদেশের ইতিহাস

'বঙ্গদর্শনের'[৭] প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'পত্রসূচনা'র পর 'ভারত কলঙ্ক' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন। পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই। বঙ্গদর্শনে শিরোনাম ছিল শুধুমাত্র 'ভারতকলঙ্ক'। পরবর্তীকালে এই শিরোনামের সঙ্গে একটি উপ-শিরোনাম যুক্ত হয়েছে—'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন' ?[৮] এই নিবন্ধের বঙ্গদর্শনের পাঠে এবং বঙ্কিমচন্দ্র রচিত শেষ পুনর্লিখনের একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ বিষয়ক ধারণাসমূহের রূপান্তর সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

এর মধ্যে দু-একটি প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে আমরা দেখছি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> 'ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজের ধার ভারতবর্ষ কখনও শোধিতে পারিবে না। ইংরাজ বাণিজ্য বাড়াইতেছে, রেলওয়ে বসাইতেছে, টেলিগ্রাম খাটাইতেছে, শান্তিরক্ষা করিতেছে, সদ্বিধিপ্রচার ও সুবিচার বিতরণ করিতেছে।'

এই তালিকা দেখে আমাদের মনে হয় যেন কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের ইংরেজ চাটুকারিতা শুনছি। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা আশ্বস্ত হই, কারণ এই চাটুকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের পরবর্তীকালে এই রচনাটির শেষ সংস্করণে ঐ ইংরেজভজনা পুরোপুরি বর্জন করেছেন। বস্তুত ইংরেজ যে ভারতবাসীর উপকারের জন্য রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ বসায়নি। তার

যে অন্যতর কারণ ছিল। ইংরেজের সম্বিধি প্রচারের থেকে, সুবিচারের থেকে' অবিচার এবং অনাচার যে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বেশি লক্ষ করেছিলেন সেই কথা এই ইংরেজ ভজনার বর্জনক্রিয়া থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অন্যত্র এর আরও বড় প্রমাণ আছে।

মোহিতলাল মজুমদার এক সময় বলেছিলেন,—'বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন রাষ্ট্রনীতির ভাবনা করেন নাই।'[৯] বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই অভিমত আমাদের একটু অবাকই করে। কারণ আমরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁকে 'Among the makers of Modern India'[১০] ভাবতেই অভ্যস্ত। বস্তুত আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি 'বঙ্গদর্শনের' পেছনে একটি সতর্ক পরিকল্পনা ছিল।[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের আলোচনায় সেই সতর্ক স্বদেশচিন্তার নানামুখী বিস্তার আমরা আরও দেখবো। পত্রসূচনাকে আমরা বঙ্গদর্শনের ভূমিকা হিসেবে যদি ধরে নেই তবে 'ভারত কলঙ্ক' বঙ্গদর্শনের সেই চিন্তাস্রোতের প্রথম ধাপ। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রধান প্রবন্ধ।[১২] এই প্রবন্ধের বিষয় থেকেই মোহিতলালের ঐ মন্তব্যের পুনর্বিচার শুরু হতে পারে। কারণ প্রবন্ধের বিষয় 'ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরসন্ধান।

বস্তুত এটি একটি ধর্মীয় আবেগমেশানো ঐতিহাসিক প্রশ্ন। ইতিহাস পড়তে গিয়ে বিশেষ করে কতিপয় মুসলমান এবং ইংরাজ ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই ধর্মীয় ও স্বজাতিবিরোধী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সত্যিই কি ভারতীয়রা হীনবল? বীর্যহীন? এ সব প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে দীর্ঘকাল ভাবিয়েছে। এবং এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সে সব প্রশ্নের যে উত্তর পেয়েছেন তা তিনি গুছিয়ে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচিন্তার ভিত্তি এই সমস্ত প্রশ্নোত্তরের উপর গড়ে উঠেছে। তাই 'ভারত কলঙ্ক' একটি বিশেষভাবে বুঝে নেবার মতো প্রবন্ধ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ভারতীয়রা হীনবল কিনা এই প্রশ্নে বঙ্গদর্শনের নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা সংশয়াম্বিত দেখি। তিনি বঙ্গদর্শনে লেখেন 'ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ব্বকালে যুদ্ধ নিপুন কি হীনবল ছিলেন, তদ্বিষয় স্থির করিবার জন্য ইতিবৃত্তঘটিত প্রমাণ এক্ষণে অতি বিরল।' কিন্তু এ বিষয়েও প্রবন্ধের শেষ সংস্করণে তাঁর যুক্তি দ্বিধাহীন ও শাণিত হয়েছে। তখন তিনি সেখানে পূর্বতন যুক্তি পরিবর্তিত করে লিখেছেন—

> 'ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার, অনেক কারণ আছে—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।'

সেখানে আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে এ বিষয়ে নানা প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের যোধশক্তি সম্পর্কে বঙ্গদর্শনের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সংশয় এই প্রবন্ধের শেষ সংস্করণে আমরা আর দেখতে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়টি নিয়ে নানা পরীক্ষা শুরু করেছিলেন কিছুটা সংশয়ান্বিত ভাবে। বঙ্গদর্শনে ইতিবৃত্তঘটিত প্রমাণের বিরলতার কথাও বলেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে ইতিহাসের গহনে সন্ধান করে করে তিনি একে একে তুলে এনেছেন তাঁর স্বস্তিকর আকাঙ্ক্ষার স্বপক্ষে নানা প্রমাণ। শেষ জীবনের পুনর্লেখনে প্রবন্ধটিতে সেই প্রমাণ সমূহই অনুস্যূত হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন ভারত হীনবীর্য হলে বঙ্কিমের শুধু স্বদেশচিন্তার নয়, ধর্মচিন্তার মূলেও আঘাত লাগে। এজন্যেই এই দীর্ঘকালীন প্রমাণ সংগ্রহের একটি নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমের ছিল।

এ গেল একদিক অন্যদিকে প্রবন্ধের দুটি পাঠ শেষ করেই আমাদের একই ধরণের অনুভূতি হয়। আমরা দেখতে পাই প্রবন্ধের নাম 'ভারত কলঙ্ক' হলেও ভারতীয়দের কলঙ্ক হিসেবে এ নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রণিধানযোগ্য কোনো হেতুর নির্দেশ করেননি। তিনি বলেন—

> 'ভারতবর্ষীয়রা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্খারহিত।'

এই সিদ্ধান্তও তর্কযোগ্য। কারণ মানুষমাত্রই স্বাধীনচিত্ত। অন্যের পছন্দ অনুসারে চলতে সব যুগেই সব মানুষেরই অসুবিধা হবার কথা। ভাবা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলেননি, বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা। তা হলেও মুঘল আমলের ইতিহাস থেকে, এমনকি ইংরাজ আমলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ উক্তির বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। এছাড়াও প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> 'হিন্দুরা যখন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাঁহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা।'

এই যুক্তিও অর্ধসত্য। ভারতীয়রা কেন পররাজ্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হননি তার কারণ এদেশের জলবায়ু, এদেশের নিশ্চিন্ত কৃষিব্যবস্থা ইত্যাদিও। বিষয়টি তাই ঐ রকম সরল নয় বরং মিশ্রিত। এছাড়াও তিনি ভারতের ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মগত ও বর্ণগত অনৈক্যকে সামাজিক সঙ্ঘশক্তি গড়ে না ওঠার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সবশেষে বলেছেন—'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা' এই দুটি বিষয় আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার থেকে লাভ করেছি। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই দুটি বিষয় জানত না। তাঁর সিদ্ধান্ত এই সমস্ত কারণই সম্মিলিত হয়ে প্রাচীন ভারতবাসীকে যুদ্ধবিমুখ ও অসামরিক করে রেখেছিল। 'জাতিপ্রতিষ্ঠা' বলতে—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে Nationalism বুঝেছিলেন।[১০]

এই আলোচনার সূচনায় আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ে আজ আমরা যাকে স্বাদেশিকতা বা স্বদেশচিন্তা বলি তার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে স্বাদেশিকতা ছিল না একথা সে দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ প্রাচীন যুগে বা মধ্য যুগে পৃথিবীর কোন দেশেই আজকের যুগে আমরা স্বাদেশিকতা বলতে যা বুঝি তা গড়ে ওঠেনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ অভিমতটি সত্য হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

মূলত এই প্রবন্ধটি আমাদেরকে শেষপর্যন্ত একটি বিভ্রমে উপনীত করে। কারণ প্রবন্ধের নাম 'ভারতকলঙ্ক' কিন্তু আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে ভারতের কোন কলঙ্ক আবিষ্কারে সক্ষম হচ্ছেন না। কলঙ্ক শব্দটির মধ্যে যে মলিনতা ও কলুষ লুকানো আছে সেরকম কোনো ক্ষমার অযোগ্য পাপের সন্ধানও বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে পান নি। বরং আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতবর্ষের কিছু স্বকীয়তা কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন।[১৪] এ অবস্থায় প্রবন্ধের শিরোনাম এবং প্রবন্ধের বিষয়ের পার্থক্য আমাদের কিছুটা দ্বিধায় ফেলে।

তবে এই দ্বিধা থেকে মুক্তির পথ আমরা পাই প্রবন্ধের পরবর্তী সংস্করণে। আমরা তখন বুঝতে পারি যে 'ভারতকলঙ্ক' প্রাচীন ভারতের কলঙ্ক সন্ধানের লক্ষ্যে রচিত নিবন্ধ নয়। প্রাচীন ভারতের মানুষদের সম্পর্কে; তাদের বীর্যহীনতা, অধীনতা, যুদ্ধবিমুখতা প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপীয় এবং মুসলমান ঐতিহাসিকরা[১৫] দীর্ঘকাল ধরে যে কলঙ্কলেপন করেছেন 'ভারতকলঙ্ক' সেই কালিমামোচনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের পরের সংস্করণসমূহে প্রবন্ধের

যে উপশিরোনামটি যুক্ত হয়েছে (ভারতবর্ষ পরাধীন কেন) তা থেকেও আমরা ঐ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রমাণ পাই। এই উদ্দেশ্যটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই উদ্দেশ্যে তাঁর সম্পাদিত সাহিত্যপত্রে প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন তখন আমরা সেই প্রবন্ধে সম্ভবত 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) রচনার অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে পারি। 'রাজসিংহে'র পদধ্বনিও হয়তো শুনতে পাই। আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়টি বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যাতনার সৃষ্টি করে। সে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরচনা, ইতিহাসচর্চা. ধর্মচর্চা, স্বাদেশিকতা সব কিভাবে একসূত্রে অনুস্যূত হয় আমরা তাও প্রথমবার অনুভব করতে পারি।

সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি উক্তি সূত্র ধরে আমরা এই আলোচনার সূচনা করেছিলাম কিন্তু সে উক্তির সঙ্গে একমত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[১৩] কারণ দেশ, জাতি, দেশের রাষ্ট্রনীতি এ সব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার কেন্দ্রীয় বিষয়। আমরা দেখেছি এ বিষয়ে তিনি ভেবেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। এবং হয়তো একই বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি একাধিক মাধ্যমে। যার একটি পরিচয় 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটির সূত্র ধরে আমরা পেলাম। কবিশেখর কালিদাস রায় এ প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

> 'দেশ-ভক্তি তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্ম। তাঁহার চরিত্রের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ বড়ই প্রখর ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিমান প্রবুদ্ধ হয়।'[১৪]

এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা আরও বলতে পারি যে ভারতের ইতিহাসকে ভ্রান্ততথ্য ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করাও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধানতম ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা। বঙ্গদর্শনে লোকশিক্ষার প্রসঙ্গের পরেই তিনি এ বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেশের রাজনীতি-বিষয়ে, স্বদেশবোধ সম্পর্কে— তাঁর যত মননক্রিয়া ঘটেছে সমস্তরই সূচনা ঐ কলঙ্কমোচনের প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে। পরে এক সময় আমরা দেখবো বঙ্কিমচন্দ্র কলঙ্কমোচন করেই নিবৃত্ত হননি ভবিষ্যৎ ভারতের চেতনাভূমি নির্মাণের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমন একটা সময়ে তিনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যখন দেশের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ছিল

না। রাজনৈতিক কোন মডেল সামনে ছিল না। ভবিষ্যতযাত্রার কোন আলোকবর্তিকা ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন বঙ্গদর্শন 'উদীয়মান সূর্যের ন্যায়'[১৮] দেশের আকাশে সে যুগে ভেসে উঠেছে। এই আলোকদীপ্তির সূচনা এই প্রবন্ধ থেকেই আমরা প্রথম পেয়েছি। এই সমস্ত ক্রিয়ার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকতেই পারে। বস্তুত ব্যক্তির স্বাধীনচিন্তার সঙ্গে দেশের অতীত ও বর্তমান অবস্থার সুযোগ্য বিশ্লেষণই তাঁর স্বাদেশিকতার মূল ভিত্তি। কালিদাস রায়ের উক্তি এদিক থেকে যথার্থ।

তবে এ আলোচনার একটি অন্যরকম বিস্তারও বঙ্কিমচন্দ্র ঘটিয়েছিলেন। ঘটিয়েছিলেন এ-প্রবন্ধের পরিপূরক অন্য একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রচার'[১৯] পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে। সেই প্রবন্ধের নাম 'বাঙ্গালার কলঙ্ক'। বঙ্কিমচন্দ্র এ-প্রবন্ধের সূচনাতেই পূর্বতন নিবন্ধের সঙ্গে এটির সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন নিম্নতন ভাষায়—

> 'যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত।'

বাঙালির চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার কোনো প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসে দেখেননি একথা বলার জন্যেই এপ্রবন্ধ রচিত হয়েছে। ইতিহাসে কোথায় কোথায় বাহুবলশালী, তেজস্বী ও বিজয়ী বাঙালির সন্ধান মেলে তার কিছু পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত গঙ্গারিডি (Gangaridae) কথা, পালবংশীয় রাজাদের বিহার বিজয় এবং গঙ্গাবংশীয়দের উড়িষ্যা বিজয় প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। সবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন ভারতবর্ষের পাঁচটি জনপদে সামরিক বীরত্বের প্রমাণ আছে। সেই জনপদ-সমূহ যথাক্রমে পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও বাংলা।

এই নিবন্ধের ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ কতটা অকাট্য তার থেকেও আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান এই লেখকের অভিপ্রায়। বস্তুত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধের পূর্বসূচনা বঙ্গদর্শনের অন্য একটি প্রবন্ধে আমরা দেখেছি। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ১২৮৭, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে 'সতের জন অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয়

করিয়াছিল' এই বৃত্তান্তকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস বলেছেন। বলেছেন যে, বাঙালি এ কথা বিশ্বাস করে 'সে কুলাঙ্গার'। তেমনি পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির যে পরাজয় হয়নি, বস্তুতঃ পলাশীতে যে কোনো যুদ্ধই হয়নি, 'তামাশা' হয়েছিল একথাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। তবে দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি অন্য কথাও বলা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট অভিপ্রায় যেখানে লেখককে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করে সেখানে যুক্তি ও তথ্যের নিরপেক্ষতা কি পরিমাণে বজায় থাকে তা সর্বদাই এক সংশয়ের বিষয়। অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন কথা প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের রচনায় আমরা বেশি পাই না। কিন্তু এ সব প্রবন্ধে আমরা এমন একজন প্রাবন্ধিকের সম্মুখীন হই যিনি সিদ্ধান্ত হাতে নিয়ে তারপর যুক্তির অনুসন্ধান করেন। প্রথমে প্রবন্ধ (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ১২৮৭) পরে উপন্যাস (মৃণালিনী ১৮০৯) পরে আবার প্রবন্ধ (বাঙ্গালার কলঙ্ক, ১২৯১) এভাবে বছরের পর বছর নানাভাবে বঙ্কিম জীবনে সেই যুক্তির সন্ধান চলে। আমরা এই একমুখীন প্রচেষ্টা থেকে বুঝতে পারি যে এটা ইতিহাসের কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে কোনো 'একাডেমিক' প্রমাণ দেবার আগ্রহ নয়। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ব্যাপার রয়েছে আরও গভীরে। আমরা কমলাকান্তকে দেখেছি 'একটি গীত' প্রবন্ধে সপ্তদশ অশ্বারোহী 'যেদিন বঙ্গজয় করিয়াছিল' সেদিন থেকে দুঃখ ও সন্তাপের সঙ্গে দিন গণনা করতে। এই সন্তাপ ও লজ্জা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকেও দীর্ঘকাল ধরে বিব্রত করেছে। যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, বীরত্ব, উদারতা ও মহত্ত্ব নিয়ে বঙ্কিমের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না সেই দেশের অধিপতি মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহীর পরাক্রমে পরাভূত হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এ কথা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। যিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন কিনা সে বিষয়েও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং একটি যুক্তিরহিত বাক্যপ্রয়োগেও অনিচ্ছুক তাঁকে এ জন্যেই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধসমূহে যেন একচক্ষু প্রচারক ও ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় দেখতে পাই। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধ তিনি শুরুই করেন কি প্রমাণ করবেন তার ঘোষণা করে। কি সেই ঘোষণা আমরা আবার পড়ে নিই—

> 'যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত।'

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক এখানে প্রশ্ন নিয়ে প্রবন্ধ শুরু করছেন না। শুরু করছেন সিদ্ধান্ত নিয়ে। এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি অবহ্মিমী। কারণ এখানে সূচনা থেকেই ভারতীয় এবং বাঙালির বীরত্ব বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় বা দ্বিধা যেন তাঁর মধ্যে নেই। কোনো বিরুদ্ধযুক্তি এ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না বরং এখানে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে দুর্বাক্যপ্রয়োগে পর্যন্ত তিনি দ্বিধাহীন। এই বিষয়টি আমাদের খানিকটা বিস্মিত করে। বিস্ময়ের আরও কারণ, বঙ্কিমের যুগে এদেশের ইতিহাস ভালো করে গড়ে ওঠেনি। অনেক ফার্সী গ্রন্থের অনুবাদ হয় নি, প্রচুর উপাদান অজ্ঞাত ছিল। সেই অনির্ণীত পরিকাঠামোর মধ্যে ইতিহাস-চর্চা হয় না একথা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতেন। তবু বাঙালি বা ভারতীয়দের সামরিক বীরত্ব কতটা ছিল তা বোঝার চেষ্টা উপাদান ছাড়াই বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। এ চেষ্টা না করে যেখানে উপাদান নেই সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলতে পারতেন, জিজ্ঞাসায় থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্নমুখীনতার কোনো মেজাজ অন্তত ঐ দুটি বিষয়ে নেই।[২০] তিনি সিদ্ধান্ত হাতে নিয়ে স্বল্পতথ্য সম্বল করে প্রমাণে নেমেছেন। মনে হয় এই বিষয়টি প্রমাণ করার এমন কোনো তাগিদ তাঁর ছিল যে সেই তাগিদে নিজের পক্ষে অনুপযুক্ত আচরণ করতেও তাঁর বাধেনি। সমস্ত স্বাভাবিক প্রশ্নকে যেন তিনি সজোরে বর্জন করতে চাইছেন। এবং এই ক্রিয়াটিকেই তিনি 'মঙ্গলাচরণ' বলেই মনে করেন।

এই অন্ধ ও অধীর আকাঙ্ক্ষা, প্রিয় মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করার এই আবেগমথিত উদ্যোগের কারণ আমরা আজ বুঝতে পারি। বোঝা যায় যে স্বজাতিপ্রেমের উগ্রতায় বঙ্কিমচন্দ্র দুর্বল যুক্তিরও ডঙ্কা বাজিয়েছেন। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি যা করেন নি স্বদেশচিন্তায় তাই করেছেন। তবে এখানে বলা প্রয়োজন এই উগ্রতা হয়তো সাধারণ দেশপ্রেমিকের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু যে মানুষের দূরদৃষ্টি আছে তাঁর কাছে প্রার্থিত নয়। তাই বঙ্কিমের এই উগ্রতা অবশ্যই আমাদের বিস্মিত করে। যে মানুষ যুক্তির সিঁড়ি থেকে কখনো এক পা নড়েন না, তিনি যদি এরকম প্রচারমুখী হয়ে পড়েন, নিজের সিদ্ধান্তটি যে-কোনো উপায়ে অন্যের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যদি একটি নির্বাচিত প্রসঙ্গেও তাঁর ব্রত হয়ে দাঁড়ায় তবে এই যুক্তি-বর্জন-ক্রিয়ায় অন্তত সেই জ্ঞানী মানুষের মননচিহ্ন আমরা পাই না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে সে রকম পেতেই আমরা অভ্যস্থ। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি দেশপ্রেমের আবেগ

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারবুদ্ধিকেও কখনো কখনো আড়াল ও আবিল করতে পেরেছিল। যে মানুষের নিরপেক্ষ দূরদৃষ্টি, পাণ্ডিত্য, দুরূহ বিষয় অনুধাবন করার ক্ষমতা আজও আমাদের বিস্মিত করে রাখে তার ক্ষেত্রে এ রকম একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় মানুষটির প্রধানতম অনুরাগ কোন্ গহনে ছিল। ধারণা করা যায় যে তাঁর প্রেম ও আবেগ কোন কারণে প্রায় অন্ধ হতে পারতো।

॥ চার ॥

॥ দেশের সাধারণ মানুষ ॥

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রথম বছরেই (১৮৭২) 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশের পিছনে একটি বিপুল পরিকল্পনা ছিল। লোকশিক্ষা ও লোকহিত ছিল সেই পরিকল্পনার পুরোবর্তী বিষয়। বলাবাহুল্য সেই পুরোবর্তী বিষয়েরই প্রথম ও প্রধানতম প্রকাশ ঘটেছে এই প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনার বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন—

> 'এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীর দুর্দশা জন্মে।'

অর্থাৎ আবার দেশের নিম্নবৃত্তের সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গ। 'বঙ্গদেশের কৃষক' বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিম রচিত বৃহত্তম প্রবন্ধ। এর আলোচনায় যে বিষয়ের ব্যাপ্তি ঘটেছে একমাত্র কৃষ্ণচরিত্র বাদ দিলে বঙ্কিমের কোনো প্রবন্ধেরই ততো বিশালতা নেই। অর্থাৎ এই প্রবন্ধটির একটি গুরুত্ব আমরা অনুভব করতে পারি তার আকারের বিপুলতা থেকেও; সে সঙ্গে যে ভাবে নানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংযোজিত হয়েছে, সরকারী আইনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নথির উল্লেখ এবং সঞ্জীবচন্দ্রের Bengal Ryot গ্রন্থের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই প্রবন্ধের চিন্তাসূত্র অনেক দিন ধরেই বঙ্কিমমানসে গ্রথিত হচ্ছিল। ১৮৭২ সালের পর ২২ বছর ধরে আমরা এই লেখককে বহু দুরূহ বিষয়ে নানারকম শ্রমসাধ্য প্রবন্ধ লিখতে দেখেছি। এই প্রবন্ধে সেই সমস্ত দুরূহকর্মের পূর্বসূচনা আমরা পাই।

কিন্তু ১৮৭২ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল পুনর্মুদ্রিত করেন নি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ এই নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হল। অর্থাৎ ঠিক কুড়ি বছর পর এই প্রবন্ধের পুনঃপ্রকাশ ঘটলো। এতদিন এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি[২১] বঙ্কিমচন্দ্র কেন অমুদ্রিত রেখেছিলেন তার চারটি কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া কেন আবার পুনর্মুদ্রণে ব্রতী হয়েছেন তার পাঁচটি কারণও বলেছেন।[২২] বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত কারণসমূহ যথার্থ কিনা এ সব নিয়ে নানারকম সংশয়ের অবতারণা করা হয়। আমরা সে আলোচনায় প্রবেশ করতে চাই না। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো। 'জমিদারের আর সে-রূপ অত্যাচার নাই' এবং 'কৃষকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে' বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমস্ত ধারণার বিশেষ প্রমাণ পরবর্তীকালের কৃষকের ইতিহাসে নেই। বরং সাধারণ কৃষকের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ সালে ঐ অভিমত লেখার পর অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শান্তিপ্রিয় বসু প্রমুখ অনেকের লেখায় গ্রাম জীবনের পতনের একাধিক চিত্র পেয়েছি। শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু তাঁর পুস্তকে হিসেব দিয়েছেন বঙ্গদেশে ১৯২১-৩০ সালের মধ্যে খাজনাবৃদ্ধি সংক্রান্ত দু'লক্ষ চারটি মামলা চাষীদের লড়তে হয়েছে।[২৩] বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারের পরে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার ইত্যাদি দু-তিনটি মধ্যস্বত্বভোগীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যেই কোথাও কোথাও ১৫টি স্তরেরও উদ্ভব হয়েছিল।[২৪] রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের বক্তৃতায় বলেছেন—

> 'গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ছলনা, বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কত দূর কি শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি।'

ফলে গ্রামের স্বস্তির যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ তে দেখেছেন তার কোনো প্রমাণ আমরা অন্যত্র পাই না। বরং প্রমথ চৌধুরীকে দেখি ইংরেজের বিরুদ্ধে আরও বড় অভিযোগ নিয়ে হাজির হতে। এমন কথা তিনি বলেন যার সামান্য ইঙ্গিতও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধে নেই—

> 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজরাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশের এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।'[২২]

শ্রী চৌধুরীর এই উক্তির দিকে ঐতিহাসিক সত্যের গতি এ কথা আমরা আজ অনুভব করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রও যে কিছুটা পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে 'ইংরাজস্তোত্র' নামের রচনাটিতে। কিন্তু এ সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বার্থবুদ্ধিতে সত্যগোপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা আমরা অযৌক্তিক মনে করি। কারণ 'বঙ্গদেশের কৃষক' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন তাঁর নিজের সম্পাদিত পত্রিকায়। এই ঘটনাই আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সে সঙ্গে তিনি একথাও লিখেছিলেন—

> 'যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয়ত সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব। কাহার নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক।'
>
> —'বঙ্গদেশের কৃষক' (জমিদার)

সত্যপ্রকাশের এই দুর্বার তেজ ও দরিদ্রের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ইংরেজের চাকুরী করা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। আমরা এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করতে চাই। কোন্ গূঢ় কারণে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর এই নিবন্ধ অপ্রকাশিত রইলো সেই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সত্যপ্রকাশ করে না কি সত্যগোপন করে এ সম্পর্কিত অনুমান[২৩] চালনার কোন গুরুত্ব এর পরে থাকে বলে আমরা মনে করি না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখে একবার ছেপে আর একবার কুড়ি বছর পর তা অপরিবর্তিত রূপে ছেপেছিলেন। এ বিষয়ে এটুকুই যথেষ্ট।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের চারটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই দীর্ঘ। যুক্তি ও তথ্য পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দেশের শ্রীবৃদ্ধি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম জমিদার, তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম প্রাকৃতিক নিয়ম এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম আইন। বস্তুত পরিচ্ছেদের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের দুর্দশার জন্যে কি কি বিষয়ের দিকে

নির্দেশ করেছেন। সেজন্যেই কৃষকদের কথার জন্য আলাদা কোনো পরিচ্ছেদ এখানে নেই, কারণ প্রতিটি অংশেই সমস্যাসমূহকে কেন্দ্রস্থলে রেখে আলোচনা গ্রথিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে'। কি ধরণের মঙ্গল তা বোঝাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রেলগাড়ি, ডাক যোগাযোগ, নগরায়ণ, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উল্লেখ করেছেন। পরক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা—

> 'হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?'

এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন এদের 'অনুমাত্র' বা 'কণামাত্র' মঙ্গলও হয়নি।[২৭] দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সেই কৃষিজীবীদের মঙ্গল না হলে দেশের মঙ্গল হয় এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন না।[২৮]

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির মূল শক্তি উপরের এই বোধে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের লোভের তীব্রতম সমালোচনা করেছেন। 'ডাকটেকস' 'হাসপাতালির' সত্যঘটনা চয়ন করে এনে জমিদারদের চৌর্যবৃত্তির প্রমাণ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে কর্ণওয়ালিসের 'মহাভ্রমে'র কথাও খোলাখুলি লিখেছেন। ইংরেজশাসনে সাধারণ মানুষের অভাবের এই খোলামেলা বর্ণনা থেকেই এই প্রবন্ধের সূচনা। জমিদার শাসিত বঙ্গদেশে সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত করেছিল। এর প্রমাণ আছে 'বাঙ্গালা শাসনের কল' (বঙ্গদর্শন—১২৮২) 'লোকশিক্ষা' (বঙ্গদর্শন—১২৮৫) ও 'রামধন পোদ' (বঙ্গদর্শন—১২৮৮) প্রবন্ধ সমূহেও। উপন্যাসেও এর প্রমাণ আছে। প্রফুল্ল যখন ভবানী পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ডাকাতি কেন করেন তার উত্তরে ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানীর প্রথম খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে জমিদারদের যে অত্যাচারের বৃত্তান্ত বলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। নারীধর্ষণ, কৃষকহত্যা, শালগ্রাম শিলা ফেলে দেওয়া কোনো দুষ্কর্মেই জমিদাররা যে পিছিয়ে ছিলেন

না একথা সেখানে স্পষ্ট হয়েছে। ভবানী পাঠকের এই অভিজ্ঞতা মূলত হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদারী অত্যাচার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। নিম্নবৃত্তের কৃষিজীবী মানুষদের ওপর ইংরেজশাসনের সময় যে কি নিষ্ঠুর পেষণ ও শোষণ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকক্ষেত্রে পাঠককে তা জানিয়েছেন। এই প্রবন্ধের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। যার নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাকৃতিক নিয়ম।' এখানে তিনি বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কারণসমূহ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। যেমন দারিদ্র্যের সঙ্গে জ্ঞানচর্চার সম্পর্ক যে পরস্পর বিরোধী নয় সে কথা বলেছেন। দেখিয়েছেন জ্ঞানবৃদ্ধি সভ্যতার মূল। এবং জ্ঞানের প্রসারই 'সামাজিক ধনসঞ্চয়'। কারণ জ্ঞানের উন্নতি না হলে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয় না। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের মাটির উর্বরতা, পরিবেশের উষ্ণতা ও জনসংখ্যার আধিক্য কি ভাবে সাধারণ-মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়েছে তাও উল্লেখ করেছেন। কি কারণে আমাদের শ্রমিককুলের মধ্যে দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বের এই সুবিপুল বিস্তার ঘটেছে তা বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন। এই অংশটি এই প্রবন্ধে সব থেকে সুবিশ্লেষিত। আজকের যুগেও এই লেখা আমাদের অবাক করে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতা প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়।' একথাটি সম্ভবত সর্বদেশে এবং সর্বকালেই সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পরে। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> 'যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এইরূপ স্বভাবগত অধোগতি হইবে।'

সাধারণ মানুষের মানসিকতার মান দেশের শাসনকর্মের মানকে নিয়ন্ত্রণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইসব অত্যাধুনিক সূত্র বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগেই বুঝেছিলেন। বস্তুত বঙ্গদেশের কৃষকের এই অনুচ্ছেদটি বঙ্কিমরচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে তুলনীয়।

এই প্রবন্ধটির সর্বশেষ পরিচ্ছেদের নাম আইন। এই পরিচ্ছেদটির অর্থনৈতিক আলোচনা এই প্রবন্ধের দুর্বলতম অংশ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তা বুঝেছিলেন। সেজন্যেই ১৮৯২ সালে প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশের সময় যে ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে বলা ছিল—

'অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটি কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না।'

এরপর প্রবন্ধের শেষ অংশ যেখানে লেখক অর্থশাস্ত্রঘটিত কিছু কথা বলেছেন।[২৯] তবে আইনের আলোচনায় হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশি সাবলীল ও নির্ভুল। কলকাতায় সাহেবরা বসে যে আইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন সে আইন কি করে গ্রামের গরীবের কাছে তামাসায় রূপান্তরিত হয় সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন।[৩০] এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কি করে রাতারাতি দেশের সমস্ত কৃষক মজুরে পরিণত হোল সেকথাও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বুঝিয়ে বলেছেন। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করার সময়ে কাল মার্কসও তার প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রাম বাংলার মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল।[৩১] প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ মার্কসের মন্তব্যের থেকে অনেক বেশি যথাযথ। তবে এ প্রসঙ্গে একটি অন্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও আছে বলে মনে করি।

এ প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' লিখছিলেন। বিষবৃক্ষে সাধারণ মানুষ নেই। তার পাত্র-পাত্রী জমিদার বাড়ীর লোক। এ সব কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালে বুর্জোয়া খ্যাতিও জুটেছে। কিন্তু এ সব সহজিয়া সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁরা জানেন না যে এ পদ্ধতিতে বিপুল রকমের বিপত্তিও ঘটতে পারে। যেমন বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যেখানে সূর্যমুখী তার ভাই তারাচরণের জন্য পাত্রী সন্ধান করে তখন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে দুটি ভাগ করেন। লেখেন,—

'ভদ্র কায়স্থরা তারাচরণকে কন্যা দিতে সম্মত হয় না,
কিন্তু অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল।'

সূর্যমুখীর ভাবনান্তর অনুসরণ করে লেখকের এই পংক্তিটি আমরা পাই। এই উক্তি থেকে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে ভদ্রলোক বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে বঙ্কিমচন্দ্র ইতর বলে ভাবতেন? ভেবে নিতে পারি কি এ হচ্ছে ডেপুটি বঙ্কিমের নীচুস্তরের মানুষ সম্পর্কে ভাবনার পদ্ধতি? বঙ্গদেশের কৃষকের কথা ভুলে গেলেও সে রকম কি ভাবা যায়? আমরা কি বুঝতে পারি না যে পংক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের বলা নয়, সূর্যমুখীর ভাবা। যে মানুষ ভদ্র নয় তাকে ইতর ভাবা

বা যে কোন মানুষকেই ইতর ভাবা কতটা সঙ্গত এই শব্দটি পাঠ করে আমাদের মনে সেই প্রশ্ন হয়তো জাগে। কিন্তু আমরা সে সঙ্গে অনুভব করি যে সূর্যমুখীর মনোভাব বোঝানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দটি প্রয়োজন ছিল। এই শব্দ বঙ্কিমের নয়, সূর্যমুখীর। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে হলে এ প্রক্রিয়ার বদলে আমাদের এক্ষেত্রে যেতে হবে প্রবন্ধে। সেখানে আমরা বুঝতে পারবো জমিদারগিন্নি সূর্যমুখী এবং লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রামা-কৈবর্তদের সম্পর্কে ধারণা ভিন্নতর। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝতে পারি যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ থেকে লেখকের মানসিকতা ধরতে যাওয়া প্রায়শই বিপজ্জনক। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এ ভুল কম হয়নি। বারবার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত আলোচনায় একাধিকবার আমাদের এ ভুলের সম্মুখীন হতে হবে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

বরং এ প্রবন্ধটিকে একটি অন্য অনুষঙ্গে দেখা ভালো। বঙ্কিমচন্দ্রের সব থেকে প্রিয় বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এ প্রবন্ধ রচনার বারো বছর আগে প্রকাশিত এক নাটকে নীল চাষের উৎপাতে কৃষকদের জীবনে কি দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল তা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধকে আমরা মনে করি সেই অসাধারণ নাটকেরই এক ভিন্ন চেহারার গদ্য সংস্করণ। সেখানে সমস্যা ছিল নীলচাষ এখানে সমস্যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেখানে কেন্দ্র-বিন্দুতে অশিক্ষিত চাষী তোরাপ, এখানে রামা কৈবর্ত ও হাশিম শেখ।

॥ পাঁচ ॥

বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ : বঙ্কিমচন্দ্র কি বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে

আজকাল সাহিত্য আলোচকেরা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী বলে থাকেন। বলা হয় সে যুগে বিদ্যাসাগর যে সব তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সে সবের বিপক্ষে। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'বিধবাবিবাহের বিপক্ষে'। লিখেছেন—

'তাঁর মতন বিদ্বান-বুদ্ধিমান-রসজ্ঞ ব্যক্তি যদি এমন সনাতন পন্থী ও রক্ষণশীল না হইতেন, বরং তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী লইয়া বিদ্যাসাগরের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে আমাদের কিছু কিছু সমাজ সংস্কার ত্বরান্বিত হইতে পারিত' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, জুন ২৬, ১৯৮৮ পৃ-১১)।

বঙ্কিম সম্পর্কে এই আক্ষেপ শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের একার নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সনাতনপন্থী, উনবিংশ শতাব্দীতে বসে তিনি পৌরাণিক যুগের সামাজিক বিধি আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে চান, এ জাতীয় আরও বহু অভিযোগ উদ্ধার করা মোটেই কঠিন নয়। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যিই কোনো নৈতিক আপত্তি ছিল কিনা তা আমরা এ আলোচনায় খুঁজে দেখবো। কারণ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দুটি পুস্তিকা (১৮৫৫) রচনার পরেও বিধবাবিবাহে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি আছে বলে যাঁরা মনে করেছেন, তাঁদের সে অভিযোগ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কালের সমাজসচেতন সাহিত্যিক মহলের প্রধান অভিযোগ। বেশ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগও। এই অভিযোগসমূহ যথার্থ কিনা, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত উদ্যোগের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই কোনো বিরুদ্ধমত পোষণ করতেন কিনা তার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকা দুটিতে নানা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে পরিষ্কার দেখিয়েছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলেই বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বিষবৃক্ষ বলেছেন, তার অঙ্কুরোদ্গমের বেশি সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যদি বিধবাবিবাহের বিপক্ষতা করেন, তবে তাঁকে স্ববিরুদ্ধতার দায়ে পড়তে হয়। তাই এই প্রসঙ্গটির একটি সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

এই বিষয়ে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কোনো পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেন নি। বরং 'সাম্য' প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন। লিখেছেন—'পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতিবিযুক্তা পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে'। এই নিবন্ধে নারী-পুরুষের বিবাহ-সম্পর্কিত সামাজিক বিধির আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রশংসা করেছেন। বলেছেন যে স্ত্রীজাতির শোচনীয় দশার প্রতিবিধান কল্পে শ্রীযুক্ত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক।' বিধবাবিবাহ সম্পর্কে প্রবন্ধাকারে এই পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘতম আলোচনা

করেছেন। এই আলোচনা রক্ষণশীল বা সনাতনপন্থী বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর বিরোধী আলোচনা নয়। এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও লেখেননি, বরং একাধিকবার তাঁর প্রশংসা করেছেন।

এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি ঐ অভিযোগসমূহ একেবারেই অহেতুক ? শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় যা লিখেছেন তার পেছনে কি কোনো সারবস্তু নেই ? বস্তুত তাও নয়। প্রবন্ধাকারে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো পৃথক লেখা নেই। কিন্তু প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে লেখনীধারণ না করলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে একাধিকবার বিধবাবিবাহের বিপক্ষে মতসঞ্চালন করেছেন বলে অনেকেই মনে করেন। যেমন 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে 'তারাচরণ' ও 'বাবু' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটিতে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তির্যক দু-একটি মন্তব্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> 'তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরম-কারুণিক পরমেশ্বর" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যাঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন" ?'

এছাড়াও এ উপন্যাসে অন্যত্র, দেবেন্দ্র যে 'দু চারিটা কাউরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন' সেই সংবাদ শ্লেষের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছেন। এসব বর্ণনা থেকে কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা ধরতে চেয়েছেন। ভেবেছেন বিধবাবিবাহের আন্দোলনকারীদের তুচ্ছ প্রমাণ করবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ রকম সংবাদ বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশন করেছেন। এছাড়া এ উপন্যাসেই সূর্যমুখী কমলমণিকে লিখেছে—

> 'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?'

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও 'বিষবৃক্ষ' ও 'সাম্য' এই দুটি গ্রন্থের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান আছে কিন্তু দুটির রচনাকাল একই। বলা যেতে পারে দুটি প্রায় একই সময়ের রচনা। এ অবস্থায় আমরা কি ধরে নেবো যে প্রবন্ধকার বঙ্কিম বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং উপন্যাসিক বঙ্কিম বিপক্ষে? আমাদের ভাগ্য ভালো যে এরকম অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই বিষবৃক্ষ উপন্যাসেই আমরা একটা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। পাই সূর্যমুখীর ঐ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে। ঐ উত্তর আছে উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে। সেখানে নগেন্দ্র বলছেন—

> 'যদি কেহ বলে যে বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে?'

এবার আমরা বুঝতে পারি এই বিদ্যাসাগর নিন্দা ও প্রশংসার সঙ্গে আর যারই যোগাযোগ থাকুক বিদ্যাসাগরের কীর্তির কোনো সম্পর্ক নেই। সূর্যমুখী বা নগেন্দ্র কেউ বিধবাবিবাহের সামাজিক পরিণতি নিয়ে চিন্তিত নন। তাঁদের লক্ষ্য অন্যত্র। বিদ্যাসাগর মূর্খ একথা প্রমাণ করা যেমন সূর্যমুখীর বাসনা নয়, তেমনি শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের পক্ষে নগেন্দ্রের উক্তি শুধু-মাত্র বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তাত্ত্বিক স্তুতিবাদ নয়। অন্য গুপ্ত বাসনাও যে নগেন্দ্রের ছিল একথা উপন্যাস পাঠকের অবিদিত থাকবার কথা নয়। অর্থাৎ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের বিরোধী—এরকম যুক্তি আমাদের মেনে নেবার কারণ নেই।

তবে কেউ হয়তো নগেন্দ্রের ঐ উক্তি থেকে একথাও মনে করে নিতে পারেন যে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষদেরই সুবিধা হয়েছিল। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সে ইঙ্গিত করেছেন। ঐ উপন্যাসদুটির ঘটনা বিশ্লেষণ করে ঐ সিদ্ধান্তে যদি কেউ পৌঁছোন তবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে একটি সৎউদ্দেশে রচিত বিধির সামাজিক প্রয়োগের সময় লোভি মানুষেরা যদি সেই বিধির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন তবে ঔপন্যাসিকের পক্ষে সেটি একটি উপাদেয় বিষয় হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় সেই বিধির জন্য কোন লোভাতুরের কোন লিপ্সা পূর্ণ হলো, কার হলো না, তাতে কে কি বলছেন বা বিপক্ষে কি আচরণ করছেন,

সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে লেখক নিজে সেই বিধিকে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করছেন কি করছেন না ; তা সম্পর্কিত নাও হতে পারে। বিদ্যাসাগর নিজে একসময় মনে করেছিলেন, তাঁর বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত যাবতীয় উদ্যোগের ফলে শুধুমাত্র কিছু অর্থলোভী ও দুশ্চরিত্র মানুষের লাভ হয়েছে। বিদ্যাসাগর নিজে একসময় সংকল্প করেছিলেন যে আর বিধবাবিবাহ দেবেন না। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত থেকে বিদ্যাসাগরকে কি বিধবাবিবাহের বিপক্ষভূক্ত মানুষ বলে ধরে নেওয়া যায়? মনে করা যায় বিধবাবিবাহ অসঙ্গত উদ্যোগ ? সমাজের কিসে হিত হয় তা কি বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থির হবে না? সে কি কোনো ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধা বা বাসনাসিদ্ধির মাপকাঠিতে স্থির হবে ?

এখানে একটি অন্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দুটি উপন্যাসে বহুবার বিধবা নায়িকাদের প্রতি দুর্বাক্যপ্রয়োগ করেছেন। এমতোবস্থায় মনে করা যেতেই পারে যে বঙ্কিম বিধবাবিবাহের বিরোধী। এবং ঐ সমস্ত কটুকাটব্যের সূত্রে ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সমালোচকও কম নেই। বস্তুত উপরের দুটি উপন্যাসেই বিধবাবিবাহের বিধির সুযোগে কিভাবে ক্ষমতাবান জমিদারেরা অনাথ ও অসহায় বিধবাদের সর্বনাশ ঘটাতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই কাহিনী লিখেছেন। সেই বিধবাদের একজন (রোহিনী) 'বিপথগামিনী' হবার পরে উপন্যাসে বহুবার লেখকের প্রচুর কটুকাটব্য শুনেছে। এই কুপিত শিক্ষকতাকে বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ বলবো, নাকি 'বিপথগামিনী' বিধবাদের প্রতি লেখকের আক্রমণ বলে ধরে নেবো ? লেখকের আত্মরক্ষার্থেও কি এই আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা ছিল না? কারণ উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বঙ্গীয় সমাজ এসব প্রণয়কাহিনীতে নৈতিক ত্রুটি ধরবার জন্যে মুখিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই অবুঝ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কথাও ভেবে চলতে হচ্ছিল। রক্ষণশীল পাঠককে প্রতি ছত্রে-ছত্রে বোঝাতে হচ্ছিল যে এই লেখক অসামাজিক প্রেম এবং পুরুষের বহুবিবাহ পছন্দ করেন না। এ জন্যেই রোহিনীর প্রতি ঐ কটুকাটব্যের অবতারনা কি হতে পারে না ? এ সব নানা দিক বিশ্লেষণ করে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি না। সে সঙ্গে শুধুমাত্র ঐ দুটি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথন এবং রোহিনীর প্রতি নিক্ষিপ্ত কতিপয় দুর্বাক্যকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে রক্ষণশীল বা সনাতনপন্থী খেতাবও দিতে পারি না।

বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ থেকে বহুবিবাহের প্রসঙ্গে এলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এ বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগরের পাশে দেখতে পাবো। বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের প্রথম মুদ্রণে বিদ্যাসাগরের কিছু তীব্র সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'দেশস্থ সকল লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাহাকে শ্রদ্ধা করি।' তাই 'বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি।' পাঠক-পাঠিকারা এখানে 'বিচার করিয়া' কথাটি লক্ষ করবেন। কিন্তু সমালোচনা তুলে দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 'বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন' প্রসঙ্গে পুরোপুরি একমত হননি। কেন হননি তার স্পষ্ট যুক্তি তিনি ঐ প্রবন্ধেই দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি সর্বান্তকরণে বহুবিবাহকে সমাজের পক্ষে অহিতকর বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই লিখেছেন—'বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকর, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে?' লিখেছেন 'বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।' এবং এই কুপ্রথার অপনোদনের জন্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে 'আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ' একথাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন।

অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি নেই। তবে আপত্তি কোথায়? আপত্তি বিদ্যাসাগরের পদ্ধতিতে। উপরের পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে অশাস্ত্রীয় ও ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলে প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে বিষয়টি নিবারিত হয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো মনে করেন নি। তিনি বলেন—

> 'এ দেশে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভালো, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা-

বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, বহুবিবাহহিন্দু-শাস্ত্র বিরুদ্ধ। অতএব যে মুসলমানবহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।'

সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'ধর্মশাস্ত্রের মুখ' দেখে এদেশে এ কুপ্রথা রহিত করা যায় না। বলেছেন—'যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।'

অর্থাৎ আজ কেউ কেউ যাকে 'Uniform Civil Code' বলতে চাইছেন সেই ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক আইনের দিকে তখনই বঙ্কিমচন্দ্র তর্জনী নির্দেশ করেছেন। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান সকলের ধর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন আইন গড়ে তুলবার কথা এখনো এদেশে কেউ কেউ বলেন। কিন্তু সেই দাবীর বিরুদ্ধপক্ষও সমাজে কম নেই। সম্প্রতি শাহাবানু মামলার সূত্রে একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগের সকলের জন্যে এক আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। দেশের সত্যিকারের অবস্থা, জাতির দূর ভবিষ্যৎ এবং যথার্থ সুনীতি, তিনটি দিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। সেজন্যেই ঐ সমালোচনা তিনি প্রকাশ্যে করেছেন। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচারালয়ে বসতে হোত। চাকুরীসংক্রান্ত কাজেও তাঁকে দেশময় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তাই এ সব বিষয়ের ভালোমন্দ তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রেই কিছু কিছু জানতেন। ফলে যে আপত্তি তিনি করেছিলেন তার পিছনে বাস্তবের দৃঢ়মৃত্তিকা থাকা অসম্ভব নয়।

বস্তুত বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহ কোনো প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান পুরোপুরি বিদ্যাসাগর বিপক্ষে ছিল না। তবে এই পদ্ধতিগত মতপার্থক্যেরও একটা মজার দিক আছে। বিদ্যাসাগরের নিজের ধর্মে বিশেষ মতি ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ভুক্তও ছিলেন না। নিজেও কোনো ধর্মমত গড়ে তোলেন নি। যে বেদান্ত নিয়ে তখন একাধিক ধর্মান্দোলন গড়ে উঠেছে সেই বেদান্তকে তিনি মনে করতেন ভ্রান্তদর্শন। অথচ সমাজসংস্কার কর্মে নেমে তিনি সেই সংস্কারের পক্ষে ধর্মীয় যুক্তিই তিনি খুঁজে বের করলেন। কেন করলেন তা বুঝতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ ধর্মীয় অনুমোদন ছাড়া কোনো সমাজ সংশোধনের কাজ এদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব ছিল না, একথা 'সেকুলার' যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর বুঝতেন।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র এ-সব সমাজশোধন কর্মের ধর্মনিরপেক্ষ রূপায়ন-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। অথচ নিজে ছিলেন ঘোরতর ধর্মাভাবাপন্ন মানুষ। তবু বহুবিবাহ কিভাবে লোপ হবে সে প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।' তিনি শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে এসব বন্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ হিসেবে 'বহুবিবাহ' নিবন্ধে তিনি বলেছেন—'যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ এবং সমাজের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।'

এই যুক্তিটি সতর্কভাবে অনুধাবন করলেই আমরা বুঝতে পারবো বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল ছিলেন কিনা। ঠিক করতে পারবো সনাতনপন্থীদের বৃত্তের মধ্যে তাঁকে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করে রাখা যায় কিনা।

॥ ছয় ॥

মানবসমাজ ও সাম্যমত

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাব[৩২] এবং বঙ্গদেশের কৃষকের দুটি পরিচ্ছেদ নিয়ে সাম্যের পরিকল্পনা। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সাম্যের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাটি লিখেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

> 'সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণ জনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চারিতার্থ হইব।'[৩৩]

শেষ বাক্যে 'অশিক্ষিত পাঠকদের' মধ্যে এই নীতি প্রচার করার অভিপ্রায় দেখে আমরা বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনার উদ্দেশ্যটির কথা আবার স্মরণ করতে পারি। কিন্তু এই কথাটি থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাক্যটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই লিখেছেন 'সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে'। সাম্যনীতি তবে কত পুরাতন? তার উত্তর আছে প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদেই। সেখানে

বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধদেবের কথা বলেছেন সবিস্তারে। যীশুখ্রীষ্টের মহতী বাণী কিভাবে রোমক সাম্রাজ্যের মর্মমূল ভেদ করেছে সে প্রসঙ্গও ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশত শতাব্দী থেকে তিনি তাঁর সাম্যতত্ত্বের সূচনা করেন। পরে এ প্রবন্ধে রুশোর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। মিলের কথা আছে। এমন কি কমিউনিজমের কথাও আছে। তবে কমিউনিজমের প্রবক্তা হিসেবে কার্লমার্কস বা এঙ্গেলসের কথা এ প্রবন্ধে নেই। এখানে কমিউনিজমের 'প্রচারকর্তা ওয়েন, লুই ব্লাং এবং কাবে'।

'সাম্যের প্রচারিত মত বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ভুল মনে করতেন'—এ কথা গোপাল হালদার মহাশয় লিখেছেন।[৩৪] তিনি এই অভিমতের সপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন।[৩৫] কিন্তু সাম্য প্রচারিত অধিকাংশ মতেরই যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, যে ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে মনে হয়, হালদার মহাশয়ের মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ সুবিচার করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশবিষয়ক প্রায় সমস্ত লেখাতেই বৈষম্যের বিরোধিতা আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অবস্থার, শিক্ষার, ও সুযোগের পার্থক্য দেশ ও জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার বলেছেন। অসাম্যকে লোকহিতের বিপরীত শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি বরাবরই। তবে সাম্যবাদী মতামত বোঝানোর জন্য বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে কয়েকটি নৈতিক যুক্তির উল্লেখ করেছেন যা পরবর্তীকালে সমাজের হিতকর বলে তিনি মনে করেন নি। তবে এরকম দুএকটি বিষয়ে মত পরিবর্তনের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি না যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধের মূলকথা অস্বীকার করেছিলেন। 'মনুষ্য সকলেই সমান' এই কথাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য' বলে মনে করতেন। তাই সাম্যের প্রচারিত মত বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ভুল বলে মনে করতেন একথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলা যায় না। এ গেল একদিক। অন্যদিকে বুঝতে হয় যে 'সাম্য' প্রবন্ধটি এক অর্থে ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন এ প্রবন্ধের সমস্ত মতবাদ তাঁর নিজের নয়। পৃথিবীতে বৈষম্যের প্রতিবাদ দীর্ঘকাল ধরে হয়েছে। রেণেসাঁর ভেতরের কথাটি হচ্ছে সাম্য, মানবতা, মুক্তি। এই দর্শনই রূপ পেল ফরাসী বিপ্লবের সূত্রে। এবং প্রায় সমকালে ইংলণ্ডে মিল ও বেন্থামের লেখায়। মানুষের অধিকার ও অবস্থার সাম্যের পক্ষে মিল ও বেন্থামের যে সব জোরালো যুক্তি

আছে তার কিছু কিছু বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাঁর নিজের মতামত এবং ব্যাখ্যাসহ সংকলিত করেছেন। সেই অর্থে মানুষের অবস্থার সাম্যের সপক্ষে এই প্রবন্ধটি একটি যুক্তিসংকলনও বটে। প্রশ্ন উঠতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র কেন এই কাজে ব্রতী হলেন? একটা দিক অবশ্য স্পষ্ট। আমরা ইতিপূর্বে 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' নিয়ে আলোচনা করেছি। 'সাম্য' প্রবন্ধের সঙ্গে সেই দুটি প্রবন্ধের অন্তর্লীন যোগসূত্র আমরা অনুভব করতে পারি। ফরাসী বিপ্লব ও রুশোর চিন্তাধারার প্রভাবও এক্ষেত্রে আমরা অনুভব করতে পারি। কিন্তু শুধু সেটুকুর জন্যেই সাম্যনীতির অঙ্কুর অশিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে ফোটানোর চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তাই কি? আরও বিশেষ কোন কারণ কি ছিল না? বঙ্কিমচন্দ্রের মনে অন্য কোনো হেতুর দংশন কি আমরা লক্ষ করি না? এবং সেই দংশন থেকে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ কিভাবে উদ্ধার পাবে তার পরিচয় এ প্রবন্ধে কোথাও নেই?

এ সব প্রশ্ন যে আরোপিত নয় তা বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কয়েকটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণ থেকে এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'আমার মন' প্রবন্ধটি। 'কমলাকান্তের দপ্তর' লঘু কলমে সিরিয়াস বঙ্কিমের রচনা। 'আমার মন' প্রবন্ধটিতে কমলাকান্ত তাঁর মন কোথায় গেল সেই সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছেন। পাকশালার খাদ্যরস, যুবতীর গভীরকৃষ্ণ নয়নতারা, কোথাও কমলাকান্ত তাঁর মন খুঁজে পেলেন না। এই হতাশাক্ষুব্ধ অন্বেষণের শেষে প্রায় জীবনানন্দের ভঙ্গীতে কমলাকান্ত এখানে বলে ওঠেন এ জন্যেই পৃথিবীতে তাঁর কোন সুখ নেই। অবশেষে কমলাকান্ত আবিষ্কার করেন 'পরসুখ ভিন্ন মানুষের অন্যসুখ' নাই। আমরাও অচিরেই বুঝতে পারি এই পরসুখবর্ধনের 'পর'টি কোনো ব্যক্তি নয়, বরং পরাধীন ভারতীয়সমাজ। কারণ এর পরেই কমলাকান্ত ইংরেজশাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজের শিক্ষার প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।[৩৯] বলেন ইংরেজের প্রভাবে 'মেটিলিয়েল প্রস্পে-রিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।' এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর যুগের মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট চেহারায় দেখেন। ইংরেজের প্রভাবে যে মানুষ 'বাহ্যসম্পদ সাধনে নিযুক্ত' কমলাকান্ত মনে করেন সে মানুষের জীবনে সুখের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে সুখ কোথায়? কমলাকান্ত বলেন সুখ পরহিতব্রতে।[৩৭] পরের জন্য আত্মবিসর্জনে। 'তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালোবাসিতে' কেউ যদি

না পারে তবে কমলাকান্ত তাঁর সংসার যাত্রাকে ব্যর্থ বলেছেন। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে শেষ বয়সে আবার এ-কথা আমরা লিখতে দেখেছি। সেখানে তিনি কিঞ্চিৎ অন্যরকম করে বলেছেন 'স্বদেশপ্রীতি' 'সকল ধর্মের উপর' (২৮ অধ্যায়, উপসংহার)। কমলাকান্ত বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশে বলেছেন 'তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না?' কমলাকান্তের এই সমস্ত প্রশ্ন, ক্ষোভ এবং আকাঙ্ক্ষায় দীর্ণ এই সমস্ত ব্যাকুলতা থেকে আমরা বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'সাম্যে'র পরিকল্পনা করেন। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র কেন ধননির্ভর ইংরেজ সভ্যতার স্বার্থান্বেষী অন্ধকারের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে বারবার প্রসারিত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে 'সাম্য' হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির কল।' কারণ বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর মনে করে এসেছেন—

> 'সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান।'[৩৮]

বঙ্কিমমানসের এই অবস্থান থেকে আমরা ভবিষ্যৎ দেশগঠনে এবং মানুষের দুর্দশাবিমোচনে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে তার একটা স্পষ্ট নির্দেশও বোধকরি পেয়ে যাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই নিবন্ধ লিখছেন তখন আমাদের রাজনীতি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্লেষ অনুসারে 'কুক্কুর জাতীয়'। কলুপুত্র কবে একটি মাছের কাঁটা চুষে ফেলে দেবে দেশের লেহনপ্রত্যাশী কুকুরের রাজনৈতিক প্রত্যাশা সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজের কাছে 'মুচিরাম রায় বাহাদুর' প্রমুখ দেশীয়দের এই রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে তিনি 'পেশাদার ঘ্যানঘ্যানানি' ও বলেছেন। 'কেহ বা মনে করেন, ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলেবুড়া জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতে থাকেন।' পরানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল এই হাস্যকর রাজনীতির উল্টোদিকে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বৃষজাতীয় পলিটিশিয়ানও দেখেছেন। শুধুমাত্র বৃষের রঙটি যে শাদা সেই কথাটি বলেন নি। তবে তার ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলাকৃতি সম্বল করে সে গায়ের জোরে কলুগৃহিনীর নাদা থেকে কি করে জাবনা খেয়ে যায় তার পরিষ্কার চিত্র দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে এই দুটি পন্থার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পায়নি। বরং প্রায় সর্বত্রই করণীয় কর্তব্য হিসেবে তিনি সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের প্রসারণকে

প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কমলাকান্তের অনন্ত রত্নভূষিতা দেশজননীর উদ্ধারকল্পে যে মানস দুর্গোৎসব হয় সেইখানে দেখি 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের' সঙ্গে 'দেশী বিদেশী', 'ভদ্রাভদ্র' 'দীনদুঃখী' সকলেই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। সেই দেশমাতার বন্দনার জন্য যে মন্ত্র কমলাকান্ত উচ্চারণ করেন তাতে আছে—

'দ্বেষকদলনী সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি'॥

এই বিদ্বেষহীন দেশ বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। কিন্তু দুটি ভিন্ন জাতের বৈষম্যের মধ্যে তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। ব্যক্তিগতজীবনে চাকরিক্ষেত্রে ইংরেজরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এক ধরণের বৈষম্য চাপিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যদখলের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশবাসীর উপর আরোপিত হয়েছিল ব্যাপকতর বৈষম্য। এসবের প্রতিবাদ তিনি বহুবার করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর দেশবাসীর মধ্যে স্তরে স্তরে যে বিভেদ যে বৈষম্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রস্তরীভূত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র তার প্রতিবাদ করেই থামেন নি। বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সেই অহেতুক অসাম্যই এই দেশবাসীর শক্তিহীনতার মূল কারণ। এবং এখানেও শেষ নয়। 'বৃষ জাতীয়' আচরণে অভ্যস্ত পররাজ্য আগ্রাসী ইংরেজদের সম্পর্কে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অশ্রদ্ধা এবং আক্রমণ আমরা লক্ষ করি তা কিন্তু কখনো কোথাও সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতি অন্যায়ভাবে প্রসারিত হয়নি। ইংরেজ প্রবর্তিত বৈষম্যের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কখনো প্রকাশ্যে কখনো হয়তো আড়াল রেখে। কিন্তু জাতি হিসেবে ইংরেজকে ঘৃণার প্রত্যাঘাত দিয়ে সেই বৈষম্যের বিরোধীতাকে তিনি কখনো অমূলক করে ফেলেন নি। এভাবে 'সাম্য' প্রবন্ধের সূত্রে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক বিস্তারের বিভিন্ন দিগন্তকে ছুঁয়ে দেখতে পারি। বুঝতে পারি শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের 'Socialist'দের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ লিখে ফেলেন নি। সাম্যনীতি তাঁর নিজের মতো করে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তারপর তাঁর নিজের দেশের ভবিষ্যৎ যাত্রায় এই নীতিই একমাত্র পথ হবে বলে মনে করেছিলেন। বস্তুত তা হয়েওছিল।[৩১] এ প্রবন্ধ রচনার আশি বছরের মধ্যে স্বাধীন ভারতের যে সংবিধান রচিত হলো সেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষের মানুষের সমঅধিকার বা সাম্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও স্বীকৃতি দেওয়া হোল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. দ্র- বঙ্কিমসরণী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, চৈত্র ১৩৭৩, পৃ-১৪

২. দ্র- নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ-১৬১

৩. 'বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের একটি তালিকাও দিয়েছেন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

৪. এই মানসিকতা পত্রসূচনায় তো আছেই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধেও আছে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অংশশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীর দুর্দশা জন্মে।'

৫. রবীন্দ্রনাথ আবার ঈষৎ অন্যরকমভাবে বঙ্গদর্শনের তাৎপর্য অনুভব করেন। তিনি লেখেন—'বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।' —বঙ্কিমপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বভারতী ১৯৭৭, পৃ-৮৬-৮৭

৬. বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন। ১২৯১, মাঘ।

৭. প্রথম খণ্ড, ১লা বৈশাখ ১২৭৯, প্রথম সংখ্যা।

৮. বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, নবম মুদ্রণ পৃ-২৩৪।

৯. বঙ্কিমবরণ—মোহিতলাল মজুমদার। দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ-১১৫। মোহিতলালের পুরোপুরি বক্তব্য—'বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন রাষ্ট্রনীতির ভাবনা করেন নাই, তাহা সত্য। জাতির রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং একের পর এক যত সমস্যা উপস্থিত হইবে, সে গুলিকে কি উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সে চিন্তাও তিনি করেন নাই।'

১০. Rishi Bankim Chandra, The Hour of God and other Writings, Sri Aurobindo, Vol. 17, P-345.

১১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন। তাঁর কথায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের জীবনে ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, এখন লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন।' (দ্র- বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, কবিশেখর কালিদাস রায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ, পৃ-২৩১) বস্তুত একেবারে 'দাস হইয়া গেলেন' এই উক্তি একটু অতিরিক্ত বলে আমাদের মনে

হয়। তবে লোকহিত ও লোকশিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকে কিভাবে অধিকার করেছিল এই উক্তি তার এক বড় প্রমাণ।

১২. একথা বঙ্কিমচন্দ্রেও বলেছেন। দ্র- 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধ।

১৩. দ্রষ্টব্য ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধের বঙ্কিমচন্দ্র কৃত পাদটীকা, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৪১

১৪. এই বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দ এ ভাবে বলেন...... 'Supreme Service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our Mother' দ্র- The Hour of God, and other writings, Sri Aurobindo. Vol. 17, P-347.

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই দুটি ভাগ করেছেন। এবং সে-সঙ্গে কিছু বিশেষণও যোগ করেছেন। মুসলমানদের বলেছেন 'মূঢ়' ও 'আত্মগরিমাপরায়ণ' ঐতিহাসিক। ইউরোপীয়দের 'কৃতবিদ্য' ও 'সত্যনিষ্ঠাভিমানী'। বলে তারপর বলেছেন তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট রচনা পাঠ করতে 'ঘৃণা করে'। এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিকদের নাম নেই কিন্তু 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে ষ্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেথব্রিজ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের নাম আছে। বঙ্কিম লিখেছেন এরা চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লেখে।' এ প্রবন্ধে মিনহাজউদ্দীনের কথাও আছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও মিনহাজের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে আপত্তি আছে।

১৬. কেন হয়নি তার একটা পরোক্ষ কারণেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র জেরেমি বেন্থামের দর্শনে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। বেন্থামের প্রথম গ্রন্থ Fragment of Government (1776) মূলত রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক রচনা। তেমনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের Thoughts on Parliamentary Reform-ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে লেখা। বস্তুত গণতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা মিল-বেন্থাম পাঠের ফলেই পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে হয়। এবং রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনাই হতে পারে না। সে চেষ্টা মিল-বেন্থামে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রেও নেই। এ-সব বিষয় অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার খেয়াল রাখেননি বলেই মনে হয়।

১৭. বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—কালিদাস রায়। প্রথম খণ্ড। পৃ-২৩০

১৮. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। দ্বিতীয় নিউ এজ সংস্করণ, পৃ-২৪৩

১৯. 'প্রচার', ১২৯১, শ্রাবণ।

২০. কেন নেই তার একটা কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই অবশ্য বলেছেন—'ইহার প্রণয়নজন্য অনবসর বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?' বস্তুত এ কথার পর আর

তর্ক থাকে না। দ্র- বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য। বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ-৪৯৭।

২১. বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন যে 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'খ্যাতিলাভ করিয়াছিল'। দ্র- বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশের কৃষক—.জ. এন. চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ১৯৫৭

২২. দ্র- 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ১৮৯২ সালে যুক্ত ভূমিকাপত্র। কেন অমুদ্রিত রেখেছিলেন তার কারণ সমূহ ১। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই ২। নতুন আইনে তাহাদের ক্ষমতা গিয়াছে। ৩। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। ৪। অনেকস্থলে এখন প্রজাই অত্যাচারী জমিদার দুর্ব্বল।'

২৩. বাংলার চাষী, বিশ্বভারতী, পৃ-৩৯

২৪. তদেব পৃ-১৭

২৫. রায়তের কথা, (পুনর্মুদ্রণ, ১৪৫৪) পৃ-৩২

২৬. এসব প্রসঙ্গে কি ধরণের লঘু মতামত প্রচলিত আছে তার একটি নমুনা তুলে দিচ্ছি। এক সমালোচক লিখেছেন—"সাম্য' এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি মোটামুটি ভাবে কাছাকাছি সময়ের রচনা। কতগুলি ক্ষেত্র তো একই। 'সাম্য'র প্রকাশনা বন্ধ করার পর কিছু অংশ তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে যোগ করে দেন। দুটোকেই তিনি ভুল বলতে চাইলেও স্মরণ রাখতে হবে যে এগুলি তাঁর নাবালক অবস্থার রচনা নয়। কিছুটা ভুল ত্রুটি হতেই পারে। কিন্তু পুরোটা ভুল কেমন করে হবে? তাহলে তো বঙ্কিম মননের সামর্থেই সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। তখন ধরে নিতে হয় এইসব চিন্তা তাঁর বৈষয়িক, কর্মজীবনের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল……"। (বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচিন্তা সূত্র ও প্রকৃতি : লেখক ডঃ জীবেন্দু রায়, ১৯৮৪, পৃ-৬৭) একাধিক ভুল তথ্যের ও যুক্তির উপর এই সমালোচনা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত দুটো প্রবন্ধের পুরোটা ভুল' এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও বলেন নি। দ্বিতীয়ত সাম্যের কোন অংশ 'বঙ্গদেশের কৃষক' এ কদাপি সংযোজিত হয় নি। বরং উল্টো হয়েছে। তৃতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এ সব বিষয়ে যে সব কারণ নির্দেশ করেছেন তাকে সমালোচক আলোচনায় আনেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে বঙ্কিমের যুক্তি ও ব্যাখ্যা ভালো করে না দেখে ইনি নিজের তথ্য-প্রমাণহীন-অনুমানকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। ফলে লেখাটি সমালোচনার বদলে আক্রমণাত্মক নিন্দায় পরিণত হয়েছে। বঙ্কিম সমালোচনার এরকম উদাহরণ কম নেই।

২৭. দু-একজন ইংরেজ লেখকের রচনাতেও এই উক্তির সমর্থন আছে। মুর্শিদাবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসিডেন্ট বেকার সাহেব লিখেছিলেন—

'It must give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the company to have Dewanee the condition of the people of this country has been worse than it was before, and yet I am afraid that fact is undoubted.' দ্র- Edward Tomson and

G. T. Garrat, rise and fulfilment of British Rule in India, 2nd Edition, 1958, Allahabad, P. 99.

২৮. বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে—'দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ......সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইয়াছে। ......কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয়শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক; আমি তুলিব না।' —বঙ্গদেশের কৃষক।

২৯. দ্র- বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন ১৯৭৩, পৃ-৪০১ পাদটীকা।

৩০. 'আইন-সে এক তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে' দ্র- বঙ্গদেশের কৃষক।

৩১. Karl Marx, notes on Indian History. P. 118,

৩২. এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৮০ এবং কার্তিক ১২৮২-তে।

৩৩. দ্র- বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাম্য প্রবন্ধ, পৃ-২৩৩। সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ।

৩৪. দ্র- সম্পাদকীয় মন্তব্য, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ পৃ-২৩৩।

৩৫. উক্তিটি নিম্নরূপ—
বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল। এখন সে সব গিয়াছে'—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গ, পৃ-১৯৮

৩৬. একটু শ্লেষের সঙ্গে বিষয়টি কমলাকান্তের 'বড় বাজার' প্রবন্ধেও আছে। আছে একটি বিজ্ঞাপনে। 'এক্সপেরিমেন্টেল সায়েন্সের দোকান' এর বিজ্ঞাপনে। দোকানটি Established-1757, on the field of plassey. দোকানের উদ্দেশ্য 'dislocate the teeth of all Indian youths' দোকানটি সুপুরি বাজার ছেড়ে এই কাজ করবে। সেই সুপুরি চার রকমের Physical, Metaphysical, Logical, Illogical.

৩৭. একই কথা আছে কমলাকান্তের 'একা' (কে গায় ঐ) প্রবন্ধেও। 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও'। চন্দ্রশেখরের প্রতাপ চরিত্র, আনন্দমঠের জীবানন্দ চরিত্র এই ভাবনার প্রত্যক্ষ রূপায়ন। এই সম্বন্ধে 'আমার দুর্গোৎসব' নিবন্ধেও আছে। সেখানে কালগর্ভে নিহিতা জন্মভূমিকে উদ্দেশ করে কমলাকান্ত বলছেন—'উঠ মা......এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।' এই হচ্ছে বঙ্কিমমানসে দেশপ্রেমিকের আদর্শরূপ।

৩৮. সাম্য, প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩৯. এ-বিষয়ে এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্যবাদের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সাম্যতরু নানা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া শুধু বঙ্গভূমিকে না, সমগ্র ভারতবর্ষকে ফুল, ফল ও ছায়াদানে আমোদিত, পরিতৃপ্ত ও সুশীতল করিবে। (ঢাকা শতবার্ষিকী সভাতে পঠিত)—দ্র- বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, রেজাউল করীম, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬১, পরিশিষ্ট, পৃ-১৪৭।

সপ্তম অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

প্রতিটি বড় লেখককেই তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নানা পরীক্ষা দিতে হয়। সাম্যমতের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর পরে সব থেকে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মুসলমান বিদ্বেষীই হন তবে তাঁর সাম্যমতের পরিধি নিতান্ত কাগুজে ও সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান বিদ্বেষের বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্নি-পরীক্ষার ক্ষেত্র।

দীর্ঘকাল ধরেই সমালোচকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানবিদ্বেষী বলে অভিযোগ করেছেন। এমনকি বঙ্গদেশে এক সময়ে তাঁর 'আনন্দমঠ'-এর বহ্নিউৎসবও হয়েছে।[১] এক সমালোচক বলেছেন মুসলমান সমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র 'পরিকল্পিত বিদ্বেষ প্রচার'[২] করেছেন। অন্যদিকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় পাচ্ছি 'বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ। একা হিন্দুর দেশ নহে।......বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে।'[৩] বস্তুত এই বিপরীতমুখী তথ্য ও আলোচনা আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি যে, বিষয়টি জটিলতামুক্ত নয়। সহজও নয়।

তাছাড়া বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণও। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা যদি মুসলমান-বিদ্বেষী সংকীর্ণ হিন্দুজাতীয়তাবাদ হয় তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে কবিতাটি লিখেছেন সেই কবিতাটিকেও প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কারণ 'রাত্রির তিমির'কে আঘাত হানবার মতো মশালের উজ্জ্বলতা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তক্ষেত্রে' আর বিশেষ থাকে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার দেশ নয়। নানা বর্ণ ও ধর্মের মহামিলনের দেশ। পরধর্ম-বিদ্বেষের নজির প্রাচীনভারতে হয়তো খুঁজে দু-একটি পাওয়া যাবে কিন্তু ঐ দ্বেষমূলক অন্যায় নীতি এ দেশে কখনো বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় নি। রবীন্দ্রসমকালীন ভারতেও ধর্মদ্বেষ অত্যন্ত নিন্দিত। এ জন্যেও বঙ্কিমচন্দ্র

সম্পর্কে এ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের একটা সুবিচার, আমাদের এই আলোচনার জন্যে বটেই, সামগ্রিক বঙ্কিম মূল্যায়নের জন্যেও প্রয়োজন।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভালো। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষের কোন অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কেউ করেন নি। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান বা তাঁদের নবী হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব বিষয়কে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন সেই সব বিষয়ে কখনো কখনো একাধিক প্রবন্ধও রচনা করেছেন। যেমন বাঙলার ইতিহাস। কিন্তু শুধুমাত্র ইসলামধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন প্রবন্ধ বা উপন্যাস নেই। এমনকি কোথাও ধর্ম হিসেবে ইসলামকে আক্রমণ করা একটি পংক্তিও বঙ্কিমসাহিত্য থেকে উদ্ধার করা যাবে না।[৩] রামমোহনের আমলে এদেশে পাদ্রীরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে নানা পুস্তিকা ছেপেছিলেন। ইউরোপে মুইর, সেল, স্পেনজার প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণ ইসলাম বিরোধী গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এ-রকম প্রত্যক্ষ ধর্মদ্বেষী-আবিলতার অভিযোগ কোথাও ওঠেনি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত নিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ। সরাসরি ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো লেখনীধারণ করেন নি। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

আরেকটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। লেখনীর পরিমাণগত দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মাপ তাঁর উপন্যাস থেকে অনেক বেশি। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষপর্বে একটি নতুন উপন্যাস রচনা এবং ইন্দিরা ও রাজসিংহের পুনর্লিখন বাদ দিলে বাকি সময়টা শুধুমাত্র প্রবন্ধরচনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার কোন বড় মাপের অভিযোগ নেই। লেখক জীবনের আদিপর্বেও বরং রামা কৈবর্তের সঙ্গে হাসিম শেখের কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষ সহানুভূতির প্রমাণ রেখেছেন তাঁর প্রবন্ধে। তাই মোটামুটি এ বিষয়ে সমস্ত অভিযোগই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে। এবং এই অভিযোগসমূহ নিয়ে আলোচনা সূত্রে আমরা বোধকরি একটি সিদ্ধান্তেও যেতে পারবো।

প্রথমেই কি ধরণের সমালোচনা এ প্রসঙ্গে প্রচলিত আছে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ডঃ মোহাম্মদ হবিবর রহমান বলেছেন—

'ইতিহাসে ওসমান কৎলু খাঁর পুত্ররূপে পরিকীর্তিত। সেই সম্পর্কের পরিবর্তন করিয়া বঙ্কিমবাবু কি ভাল করিয়াছেন? ফুটনোটে ওসমানের সহিত কতলু খাঁর ইতিহাসসম্মত সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তিনি মুসলমান সমাজের উপর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন বই আর কিছু নয়। আমরা এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাহি না। বঙ্কিমবাবু তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে মুসলমানের প্রতি যে ভাব পোষণ করিয়াছেন, তাঁহার সর্বপ্রথম গ্রন্থেই তাহার সূচনা দৃষ্ট হয়।' (নবনূর, বৈশাখ, ১৩১২)।

সমালোচক ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছেন—

'হিন্দু নায়কের জন্য অসূর্য্যম্পশ্যা মুসলমান বাদশাহজাদিগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির কর—হতভাগ্য মুসলমানদিগকে তীব্র বিদ্রূপবাণে মর্মাহত কর...খুব মজাদার একখানা উপন্যাস হইয়া গেল। ...হিন্দু মুসলমান হিংসা প্রজ্জলিত হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি ত রায়বাহাদুর বঙ্কিম।' ('সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন' নবনূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০)।

আলোচক এস. এম. আকবরউদ্দীন 'আল্ এস্লাম' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় বঙ্কিমউপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 'বঙ্কিমে মুসলমান' প্রবন্ধে..বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙলা সাহিত্যের 'তাজ' বিশেষণে ভূষিত করেও তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কেননা, তাঁর মতো 'জ্ঞানী ও মনীষী জাতিবিরোধের হাত' থেকে মুক্ত নয় (দ্র- বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান, পৃ-৬৯০)। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম' গীত সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি হওয়া সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই গীত থেকে মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে 'প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি আমাদের এত হেয় মনে করেন যে...... নব জাতি গঠনে (মুসলমানকে) হিন্দুদের পদানত থাকিতে হইবে।' অতঃপর 'আনন্দমঠ'-এ কথিত 'যবনপুরী', 'শুয়ারের খোঁয়াড়' ইত্যাদি মন্তব্যের উল্লেখ করে সমালোচক বলেন—

'এইস্থানে তিনি যে জাতীয় বিদ্বেষ ও জাতিবিরোধের পরিচয় দিয়া গেলেন, তাহা আমরা কোন মতে ক্ষমা করিতে পারি না। ...... আমাদের বিশ্বাস তিনি বিদ্বেষবশে অথবা আমাদিগকে হেয় করিবার জন্যই এই কথা লিখিয়াছেন।'

'সীতারাম' শিরোনামায় 'সীতারাম' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ফকিরের শরীরে গঙ্গারামের পদস্পর্শের ঘটনা এবং তার পরিণতি বিশ্লেষণ করে সমালোচক বলেন—

> 'আসল কথা জোর করিয়া এমন একটা কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে বেশ প্রমাণ করা যায় যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদের কারণ মুসলমান এবং সেই বিবাদে মুসলমানেরই অন্যায় ও সে নিকৃষ্ট।'[৫]

সমালোচক আব্দুল মালেক চৌধুরী মুসলিম নারী চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মান' হয়েছেন।[৬] এ-প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ মুনীর চৌধুরীর মতামতও উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক চৌধুরী 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থে 'রাজসিংহ' মুসলমানদের কাছে কেন অপ্রিয় তার অনেকগুলো কারণ নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন চঞ্চলকুমারীর তসবির ভাঙার কথা। লিখেছেন—

> 'রূপনগরের রাজকন্যা যে আওরঙ্গজেবের চিত্র পদদলিত করেছিল সে কথা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে লিখে রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। টড, মান্থুচী, অর্মেরও তা অসাধ্য ছিল। এই অঘটন ঘটাবার পটুত্ব শিল্পী ছাড়া আর কার থাকতে পারে?......রূপনগরের রাজকন্যা ও আওরঙ্গজেব প্রতীক মাত্র। দলনের অভিপ্রায় নিয়ে পদত্তোলনের আগ্রহটা বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত।'

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

> 'রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।
>
> '—রাজসিংহ উপন্যাসের নির্মলকুমারীর মুখের এই কথাও অস্বাভাবিক। নির্মলকুমারী নির্ভীক রাজপুতকন্যা হলেও দিল্লীর বাদশাহের মুখের উপর কি ঐ কথা বলা সম্ভব? আর বাদশাহও এর উত্তরে কিছুই বললেন না।'

উপরের উদ্ধৃতিসমূহে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা নির্ণয়ের কয়েকটি প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পেলাম। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে হিন্দু সমালোচক বা মুসলমান সমালোচক এ ভাবে সাহিত্য সমালোচনার কোনো ভাগ হতে পারে না। তবু মাত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সমালোচকদের আপত্তি উদ্ধার করা হোল

বঙ্কিম সমালোচনার একটি ক্ষুব্ধ অবস্থানকে বোঝার জন্য। সাহিত্যের ধর্ম-ভিত্তিক সমালোচনা উচিত নয়, যেমন অনুচিত ধর্মদ্বেষী সাহিত্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে লেখকরা তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রের আলোচনা ধর্মমুক্ত মন নিয়ে করছেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ যে সমালোচক করেছেন তাঁর নিজের অভিমত কতটা সংকীর্ণতামুক্ত সে অন্য প্রসঙ্গ তবে দেখছি তাঁদেরও ধর্ম আছে। এবং নিজের ধর্মে দাঁড়িয়ে সাহিত্য-বিচারের প্রবণতাও আছে। ফলে এর মধ্যে সমালোচকদের একটু স্ববিরোধীতাও লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে পরধর্মদ্বেষী বলে যাঁরা অভিযোগ করেছেন নিজের ধর্ম সম্পর্কে স্পর্শকাতরতাও তাঁদের কম নয়। তবে এ বিষয়টির এ ভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না। বহু প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা এবং উভয় ধর্মের অনেক ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচক এ প্রসঙ্গে নানা দিকের নির্দেশ দিয়েছেন। সামগ্রিক মূল্যায়নে যাবার আগে আমরা সেগুলো একে একে দেখে নিতে চাই।

শ্রী নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন—

> 'ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য সূচিত হয়েছিল তার বীজ রোপণকারীদের মধ্যে বঙ্কিম একজন এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস অতিশয় ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছিল বলেই আমাদের ধারণা। বইখানা রীতিমত সাম্প্রদায়িক। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি এই উপন্যাসে যে পরিকল্পিত বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে তা দাস্যমনোভাব প্রসূত তথা স্বার্থ প্রণোদিত ইংরেজ ভজনার দোষকেও ছাড়িয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য, শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা কিন্তু বিস্ময়কররূপে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ মুক্ত ছিল। যে ঔপন্যাসিক আয়েষা, ওসমান, মতিবিবি, দলনীবেগম, মবারক প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় চমৎকার সব মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন তিনি সাম্প্রদায়িক অনুদারতায় ভুগতেন এ কথা কেমন করে বলা যায়? অথচ মতসম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিপরীত সাক্ষ্যেরই প্রাবল্য বেশী। সেখানে সম্প্রদায়গত চিত্তকার্পণ্যের নজীর এত অকাট্য যে, দেখেও না দেখার ভান করা ছাড়া সে বিষয়ে অনবহিত থাকা যায় না। তবে চোখ বুজে থাকলেই যে কোন অপ্রীতিকর বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব নাকচ হয়ে গেল এমন নাও হতে পারে।''

নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্ধৃত ব্যাখ্যাটির নানা রকমের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপনকারী' বলেছেন। তাঁর রচনায় 'পরিকল্পিত বিদ্বেষ' দেখেছেন। 'দাস্তমনোভাবপ্রসূত তথা স্বার্থপ্রণোদিত ইংরেজ ভজনার' দোষের থেকেও হীনতার বিষয় তাঁর লেখায় পেয়েছেন। সেই সঙ্গে আবার বলেছেন যে শিল্প হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত ছিলেন। কারণ তাঁর চমৎকার সব চরিত্রসৃষ্টি।

বস্তুত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় যে সব অভিযোগ করেছেন, একজন লেখক সম্পর্কে এর অধিক বোধকরি করাও যায় না। এই মন্তব্যসমূহকে সমালোচনা বলা যাবে কি না সে অন্য প্রশ্ন তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এ সম্ভবত কঠোরতম উক্তি। এই ব্যাখ্যার প্রথম অনুচ্ছেদের 'পরিকল্পিত বিদ্বেষ' সৃষ্টিকারী স্রষ্টা কি করে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই শিল্পী হিসেবে 'বিস্ময়করভাবে সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত' হয়ে পড়েন এই অদ্ভুত 'বিস্ময়'টি আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যদি সাম্প্রদায়িকতামুক্তই হন তবে অন্য কোথায়, কোন ভূমিকায় তিনি সাম্প্রদায়িক? শিল্পী বঙ্কিমকে বাদ দিলে কোন বঙ্কিম থাকে? বিশেষত উপন্যাসে? আমাদের এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর শ্রীচৌধুরীর লেখায় নেই। দেখা যায় শ্রীচৌধুরীর অভিযোগ যেমন মারাত্মক তাঁর অভিযোগমুক্তিও তেমনি আকস্মিক ও সামঞ্জস্যহীন। মনে হয় শ্রীচৌধুরী বঙ্কিমচেতনার অন্তরালে দেখবার চেষ্টাই করেন নি। তিনি বঙ্কিমনিন্দা ও বঙ্কিমপ্রশংসার দুটি বিপরীতমুখী পুরোনো ধারণার মধ্যে প্রথমে এদিকটা একটু বাড়িয়ে বলে তারপর ওদিকটাও একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই ঝাঁঝালো বক্তৃতায় নানা প্রান্তের নানা কথা আলোচকের মনে এসেছে। কিন্তু সবশেষে দ্বিধা, সংশয় ও সিদ্ধান্তহীনতা থেকে এই আলোচক নিজেই মুক্তি পান নি।

সমালোচক রেজাউল করীম মহাশয় বঙ্কিম সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে।[৮] বিস্তারিত আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' নিয়েই সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে কিন্তু 'আনন্দমঠ' কোন দিক থেকেই মুসলিম বিদ্বেষে সহায়তা তো করেইনি বরং তা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষ সমস্ত মানুষকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। তিনি আরও বলেছেন—

'রাজসিংহ' 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসকেও মুসলিম 'বিদ্বেষপূর্ণ' গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু এতসব 'বিদ্বেষপূর্ণ' গ্রন্থ থাকিতেও দেশে জাতীয় আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সেই আন্দোলনে যোগ দেয়, আর হিন্দুর মুখ হইতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভালোবাসার বাণী উচ্চারিত হয়। স্বদেশী যুগের কর্মীদের কাছে 'আনন্দমঠ' ছিল বাইবেলের মত পবিত্র। কিন্তু সে যুগের কোন কর্মীই মুসলিম বিদ্বেষে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই। মুসলিম বিরোধী কোন ভাবধারা তাঁহাদের অন্তরকে কলুষিত করে নাই। কংগ্রেসের আন্দোলন, হোমরুল, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাদর কমে নাই। হিন্দুরা দলে দলে খিলাফতে যোগ দিল, মুসলমানরা কংগ্রেসে। 'আনন্দমঠে'র তথাকথিত মুসলমান বিদ্বেষ এক্ষেত্রেও কার্যকর হইল না। বঙ্কিম সাহিত্যে এই যে মুসলিম বিদ্বেষের সন্ধান লাভ ইহা নতুন ও আনকোরা কথা। বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কাছে সাহিত্যকে নিযুক্ত করিলে পরিশেষে সাহিত্যেরই সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়।'[৯]

প্রায় একই সুরে কথা বলেন ডঃ আহমদ শরীফ মহাশয়। আওরঙ্গজেবের তসবিরে চঞ্চলকুমারীর পদাঘাত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

'চঞ্চলকুমারীর আওরঙ্গজেবের তসবিরে পদাঘাত, আর মুসলিম গোঁয়ারের রাস্তা প্রতিরোধ (সীতারামে) মানুষের একই নীচ প্রকৃতির প্রকাশ। লক্ষণীয়, চঞ্চলকুমারী আকবর জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কাজেই এ জাতিবিদ্বেষ নয়, স্ব-কালীন শাসক বিদ্বেষ।'[১০]

উপরের উক্তিসমূহে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে সমালোচকদের মতামতের একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করা গেল। বোঝা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক কি না সে বিষয়ে মতভেদ এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচকদের মধ্যেও প্রবল রকমের। তবে আবার বলি, আমরা সমালোচকের ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করে সাহিত্যবিচারে নিয়োজিত হতে চাইনা। মুসলমান সমাজও এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রকে দ্বিধাহীনভাবে সাম্প্রদায়িক বলে নি এ কথা প্রমাণ করবার জন্যই উপরের উদ্ধৃতি সমূহের সংকলন। তবে এরপরেও প্রশ্ন থাকে। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তা এবং ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ সমূহকে কেউ কেউ যোগ করেন। আমরা সেই প্রসঙ্গসমূহের আলোচনা করে এ বিষয়ে মূল বক্তব্যে যাবো।

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ মনীষীর মতো বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ধর্ম-সংক্রান্ত ধারণাসমূহের একাধিক পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের বিচার করতে হলে সেই বিবর্তনও ভালো করে দেখে নেবার প্রয়োজন আছে। কারণ মুসলমানবিদ্বেষের পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্মমতকে অনেকেই দেখেছেন। তবে এই ব্যক্তিগত ধর্মমতও চিরদিন একরকম ছিল না। যে বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন, তপের আশ্চর্য ক্ষমতা, জ্যোতিষীর নির্ভুল প্রয়োগ ও সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী যার উপন্যাসে প্রচুর; যিনি নির্দ্বিধায় একাধিক অর্ধেক দেবতা অর্ধেক মানুষ চরিত্র অঙ্কন করেন, তিনি কিন্তু একসময় সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন। এ ছাড়াও মৃণালিনীর বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তা এবং সীতারামের ধর্মচিন্তায় পার্থক্য আছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত বিষয়টি কোনো স্থির বিষয় নয়। এই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামাতার বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন। কারও কারও মতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর জন্মেরও বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া একটি রহস্যপূর্ণ কাহিনী। এই বৃত্তটি স্পর্শ করে আসা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। তাঁর জীবনীকারেরা[১১] যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র আঠারো তখন তাঁর জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী যাদবচন্দ্র একজন 'ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজুটধারী পরিধানে গেরুয়া বসন, পদযুগলে খড়ম এক অতি দীর্ঘকায়' পুরুষের দ্বারা জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। এবং সেই আঠারো বছর বয়স থেকে অষ্টাশি বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ সত্তর বছর তিনি সেই গুরুদেবপ্রদত্ত উপবীত ও খড়ম পূজা করতেন।[১২] পিতার এই সুদীর্ঘ ধার্মিক জীবন যাপনের প্রভাব এবং বিশেষ করে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে সন্ন্যাসীর কৃপায় জীবনপাওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেও কিছুটা ছাপ ফেলেছিল বলে অনেকে ধরে নিয়েছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব বিশেষ ছিল না বলে সাক্ষ্য পাই। এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বলেছেন 'মা

ছিলেন সেকেলের উপর আর একটু বেশী ; কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি।'[১৩] তবে পিতা যাদবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সাহচর্যও তিনি খুব বেশি পাননি। কারণ যাদবচন্দ্রকে কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই উড়িষ্যার এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল। তাছাড়া বঙ্কিমজীবনী[১৪] থেকে জানা যায় যে তিনি এমন একটি সনাতন ধর্মের আবহাওয়াতে বেড়ে উঠেছিলেন যার একটি চিরস্থায়ী প্রভাব তাঁর মনের মধ্যে থেকে যেতে পারে।

প্রথম যৌবনে পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে এবং বিজ্ঞানচর্চার ফলে মধ্যজীবন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হয়ে উঠেছিলেন কিছুটা সংশয়বাদী। মিল, বেন্থাম ও কোমত্ গভীরভাবে অধ্যয়নের ফলে যে সংশয়বাদ তাঁর মনে জমা হয়েছিল তার মধ্যে কিছুটা নাস্তিকতার প্রবণতাও ছিল।[১৫] নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্র কবে কিভাবে যে হিন্দুধর্মে আবার অনুরাগ ফিরে পেলেন সে কথা বা সে ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে আমরা দেখছি যে তিনি যখন বারুইপুর ছিলেন, তখনও নাস্তিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে থাকার সময়কার কথা, তাঁর স্নেহভাজন সেখানকার রেজিষ্ট্রি অফিসের হেডক্লার্ক কালীনাথ দত্ত লিখেছেন—

> 'বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদগুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।'[১৬]

আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময়, 'মৃণালিনী' রচনার সময়, অথবা তার কিছু আগেই নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের মন থেকে এই অবিশ্বাসী ভাব কেটে গিয়ে আস্তিক্যভাব ফিরে এসেছে এ আমাদের অনুমান। এই অনুমানের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই, তবে এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে, ১৮৬৯ এর জানুয়ারী মাসে বি, এল, পরীক্ষা দেওয়ার আগে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে তিনি দেখতে পান সেখানকার হিন্দু মন্দিরগুলির উপর তুর্কী মোগলদের অত্যাচারের চিহ্ন। ওখানকার গাইডরা ও পাণ্ডারা হিন্দুমন্দির ও দেবতাদের উপর মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বঙ্কিমকে শুনিয়েছিলেন এবং তিনি মুসলমান বাদশাহদের প্রতি, বিশেষ করে মোগলবাদশাহ ঔরঙ্গজেবের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। তারই

ফলশ্রুতি নাকি দেখা যায় পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসে। শ্রীরায়ের অনুমান নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্র সেই থেকে ক্রমাগত হিন্দুমুখী হয়ে পড়েন।

বস্তুত 'প্রচার' (১২৯১) পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা এক প্রবল রকমের ধর্মজিজ্ঞাসার প্রবণতা লক্ষ করি। উপরের কারণসমূহ নিয়ে গবেষণা হতেই পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ধর্ম-অন্বেষার জাগরণ ঘটতে পারতো। কেশবচন্দ্র সেন[১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সে সময়ে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের ধমমত নিয়ে, সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব নিয়ে, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেবের নতুন মতাদর্শ নিয়ে, বঙ্গদেশে একটা প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। এই আলোড়ন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দীপিত করেছিল তার প্রচুর প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ তার ভারতীয় ঐতিহ্যকে মনে রেখে সম্মুখবর্তী হবার মতো একটি সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় মডেলের সন্ধানে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ দুটি দশকে নিজেও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এই সময়ের হিন্দুধর্মের যে নূতন আত্মজিজ্ঞাসা এবং নবমূল্যায়ন প্রচেষ্টা, তার প্রকৃতি ছিল সৃজনাত্মক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মত করে এই সৃজনাত্মক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে প্রমাণ আছে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' পুস্তকে, গীতার নতুন ব্যাখ্যায়, রাজসিংহ চরিত্র রূপায়ণে। সেই সময়ে হিন্দু চিন্তানায়কদের মধ্যে একটা পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছিল। নানা আচার, নানা অন্ধবিশ্বাস থেকে ধর্মমতের বিশুদ্ধ অংশটি কি করে উদ্ধার করা যায় এবং আধুনিক জীবনের নতুন প্রয়োজনে তাকে কি করে ব্যবহার করা যায় এটাই ছিল সে যুগের মুখ্য চিন্তনীয় বিষয়। কোনো বিদ্বেষ বা কোনো ঘৃণা থেকে এই আত্মানুসন্ধানের সূচনা হয়নি। এই আত্মানুসন্ধান অন্তর্মুখী। ইতিহাসে ও দর্শনে সে পথসন্ধান করছিল। সমাজে বিদ্বেষরচনা করে সমস্যার নিরসন সেই সন্ধানের মুখ্য তো নয়ই, খণ্ডিত লক্ষ্যও ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', 'সাংখ্যদর্শন', 'চিত্তশুদ্ধি' প্রভৃতি প্রবন্ধ কোনোরকম বিদ্বেষ থেকে রচিত নয়। এর মূল লক্ষ্যও সৃজনাত্মক। কারণ আগেই বলেছি মাইকেল মধুসূদন যেমন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' বঙ্গদেশের লোকদের 'মজতে' দেখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি অলীক কুধর্মে দেশের মানুষদের মজতে দেখেছিলেন। সেই ধর্মের জাতিভেদপ্রথা, আচার সর্বস্বতা, অন্ধ-

ভক্তিবাদ, স্বার্থান্ধমুক্তিপ্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে চিন্তিত করেছিল। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে লক্ষ্মণ সেনের কাতরোক্তি এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। দ্বারে যখন শত্রু তখন লক্ষ্মণ সেন নিজের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা বলছেন। রাজার এই বৈরাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দনীয় মনে করেছেন। এই হেতুতেই সংসার পরিত্যাগ করার জন্যেই যীশুখ্রীষ্ট বা বুদ্ধদেবকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে মানবশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেন নি। প্রাত্যহিক দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করে, মানবিক প্রবৃত্তিসমূহকে প্রতিহত করে কি প্রক্রিয়ায় মানুষ বৃহৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন তার একটি অনুকরণীয় আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে গড়ে দিতে চেয়েছেন। এই দুটি উদ্দেশ্যের সামনে মুসলিমবিদ্বেষ কখনো আসে না, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতের যে বিশিষ্ট লক্ষ্য তাতে মুসলিমবিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। প্রয়োজনও নেই। নিজের জমিতে বাগান গড়তে গিয়ে অন্যের বাগিচা না কাটলেও চলে।

এই প্রবণতার একটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসসমূহ থেকেও। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী' বা 'রাধারানী' সবই বঙ্কিম সমকালীন জীবনভিত্তিক উপন্যাস বা গল্প। এই সব রচনায় কোথাও মুসলমান বিদ্বেষের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষ যাঁরা দেখেন তাঁদের কল্পনার রসদ জোটে শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস থেকে। সেই রসদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এই রচনার সূচনাতে উদ্ধার করে দিয়েছি। এবং তার খুব সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনাও আমরা সেখানে করেছি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এদেশে এক সময়ে নজরুল ইসলামের মতো অসাম্প্রদায়িক মানুষকেও 'কাফের' বলা হয়েছে। ইংরেজের ভেদনীতির ফলে গত শতাধিক বছর ধরে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে এদেশ একটু বেশি মাত্রায় স্পর্শকাতর। এ জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যেও ঐ কলঙ্কের প্রসাধন হয়তো জুটেছে। অন্যকারণের কথা অনুমান করেছেন প্রাবন্ধিক রেজাউল করীম। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ করা হইয়াছে'।[১৮] যে কারণেই হোক বিষয়টির সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের, বা জীবনদর্শনের কোনো সম্পর্ক আমরা এখনো দেখতে পেলাম না। একজন লেখককে সাম্প্রদায়িক বলে ফেলা খুব সহজ নয়। তবুও আবেগের বশে কেউ কেউ তা বলে ফেলেন; কিন্তু যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের সময় আর থই মেলে না।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্প্রদায়িক নন, তিনি যে হিন্দু মহাসভা বা মহম্মদ আলি জিন্নার পূর্বসূরি নন, এ-কথার সব থেকে বড় প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-চিন্তায় পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত শুধুমাত্র হিন্দুর ভারত নয়। সেই ভারত মুসলমানেরও ভারত। হিন্দু মুসলমান সলিডারিটির কথা বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের কথা কল্পনা করেন নি। একথা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আলোচনা করে দেখিয়েছেন।[১৮] যে 'বন্দেমাতরম্' গানটি নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই তাতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতকোটি বাঙালির কথাই বলেছেন। হিন্দু-মুসলমান ভাগ করেন নি। ডঃ শহীদুল্লাহ এ প্রসঙ্গের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন।[২০] সেই উক্তিতে শুধু জাতিভেদ নয়, সর্বপ্রকারের ভেদজ্ঞানকেই অন্যায় বলে মনে করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সবশেষে মানবতার এই স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই কথাটি 'সাম্য' প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে বুঝতে হবে। নাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হয়।

তবে এর পরেও একটা প্রশ্ন থাকে। মেনে নেওয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ ছিল না, কিন্তু কিছু মুসলমানের প্রতি দুর্বাক্য-প্রয়োগে তিনি প্রায়শই যে দ্বিধাহীন তার প্রমাণও বঙ্কিমরচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। 'ক্ষৌরিতচিকুর' 'গোহত্যাকারী', 'নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকক্ষেত্রেই পিছুপা হন নি। 'রংপুরের ইতিহাস' লিখতে গিয়ে বা 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নিবন্ধে এমনকি কমলাকান্তের 'একটি গীত' প্রবন্ধেও যবনসেনা এবং মুসলমানের পদাঘাতের প্রসঙ্গ আছে। বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গজয়ের উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তত আটটি প্রবন্ধ এবং একটি উপন্যাসে আছে। মিনহাজউদ্দিন বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ থেকে কখনও মুক্তি পান নি। প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন এই দুর্বাক্যপ্রয়োগ! কেন এ রকম ক্রোধের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ! জিজ্ঞাসা জাগতে পারে এর পেছনে কি জাতিবিদ্বেষ নেই? মূলত এ সব প্রশ্ন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নানা সময়ে নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সে ব্যাখ্যাসমূহের দু-একটি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। এ সব ছাড়াও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহার কথাও কেউ কেউ তুলেছেন। শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় তাঁর বঙ্কিম রচনা সংগ্রহের ভূমিকায়[২১] বলেছেন হিন্দু জাতি যেহেতু বাস্তবে পরাজিত জাতি

তাই সেই পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানিমুক্তির আকাঙ্ক্ষাতে বিজয়ী জাতি—মুসলমানদের বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে কালিমালিপ্ত করেছেন।

শ্রীহালদারের এই অনুমান একটু বেশি আক্রমণাত্মক। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এবং বঙ্কিমের বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধে রচিত একাধিক প্রবন্ধে বঙ্গদেশে মুসলমান বিজয়ের ঘটনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের সামাজিক ও নৈতিক পতনের মূল কারণ বলে বারবার নির্দেশ করেছেন। নিজের ধর্মের অবক্ষয়ের প্ররোচক শক্তি হিসেবে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসারকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। আজকের বিচারে এই মূল্যায়ন সাম্প্রদায়িক মনে হতে পারে। কিন্তু সে যুগে যখন প্রতিনিয়ত ভারতের পূর্বগৌরব হারানোর পরিতাপ করতে হচ্ছিল তখন ঐ মূল্যায়ন অসম্ভব ছিল না। ইংরেজ শাসনকে যখন চিরস্থায়ী বলে মনে হচ্ছিল; কেন ঐ পরাধীনতা, কেন বারবার এত পরাজয়, কেন ঐ পরিমাণ শক্তিহীনতা, এ সব প্রশ্নের জবাব যখন প্রতিনিয়ত খুঁজতে হচ্ছিল, তখন হিন্দুবোধে দাঁড়ালে মুসলমান অধিকারকে ঐ দুর্বলতার কারণরূপে চিহ্নিত করা সে যুগে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রবণতাই হতে পারতো। বিশেষ করে মুঘলযুগের মুসলমানদের সম্পর্কে সেকালীন হিন্দু অভিমতই ঐ রকম প্রতিকূল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একসময় হিন্দুবোধে দাঁড়িয়ে ঐ বিষয়সমূহের বিচার করেছিলেন এই তাঁর অপরাধ। এ জন্যেই সে যুগের ইতিহাসআশ্রিত উপন্যাসে নীচপ্রবৃত্তির মুসলমান চরিত্র বেশি দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করেই ঔরঙ্গজেবের অধর্মের কথা বলেছেন রাজসিংহের ভূমিকায়। কিন্তু মুসলমান সম্পর্কে দুর্বাক্যসমূহের এই স্ফুলিঙ্গ একটি যুগের ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবপ্রসূত বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মূল ভ্রান্তি ছিল হিন্দুবোধে দাঁড়িয়ে ইতিহাস বিচারের মধ্যে। কিন্তু ধর্মমুক্ত নিরপেক্ষ মানসিকতা সে যুগে কোথায় পাবো? রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল সবাই সে যুগে ধর্মীয় চেতনার মিশ্রণ ঘটিয়ে দেশ গড়বার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই মনীষীদের সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা এসব কথা উল্লেখ করেছি। ফলে আজকের দিনের বিচারের রঙ লাগিয়ে বিষয়টিকে আমরা সাম্প্রদায়িক বলতে পারি না। বস্তুত খ্রীষ্টান সাহেবদের চিত্রায়ন 'দেবী চৌধুরানী' বা 'চন্দ্রশেখর'এ খুব মনোরম নয়। গোপাল হালদার মহাশয় সে জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কোথাও সাম্প্রদায়িক বলেননি। বলেননি সেখানে পরাজিত জাতির গ্লানিমুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্রায়িত হয়েছে। বস্তুত মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হিন্দুজাতির

সাহিত্য সংস্কৃতিতে ও সমাজে যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছিল তারজন্য মুসলমানদের 'চতুরতা', 'পাপাচার' ও 'ধর্মহীনতা'কে বঙ্কিম দায়ী করেছিলেন। এই বিচার ভুল হতে পারে তথ্যসংগ্রহের ভ্রান্তিতে। বিশ্লেষণে তা লক্ষ্যচ্যুতও হতে পারে। কিন্তু বুঝতে হবে যে বঙ্কিমের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে সমস্ত আপত্তিকর বিশেষণের প্রয়োগ ঐ ক্ষুদ্র ইতিহাসচিন্তার গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ। ঐ চিন্তা ইসলামকে আক্রমণ করার জন্যে নয়। বঙ্কিম সমকালীন মুসলমানদের সম্পর্কেও সেই নিন্দাবাক্য প্রসারিত হয় না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর শেষ জীবনে এই ইতিহাসকেন্দ্রিক মুসলিম-শাসক-বিদ্বেষ থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯১ শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ সালের মাঘ পর্যন্ত 'প্রচার' পত্রিকায়। এই উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই। প্রথম সংস্করণ ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠে কিন্তু পার্থক্য আছে। প্রথম সংস্করণের অনেক অংশ বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে বর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণ সাহিত্যগত কারণে। কিন্তু সেই বর্জিত অংশ অনুসন্ধান করে হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তাঁর শেষজীবনে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

প্রথম সংস্করণের অষ্টম পরিচ্ছেদেই এর প্রথম প্রমাণ পাই। সেখানে পলায়িতা শ্রীর সঙ্গে এক মুসলমান সিপাহীর বাক্যালাপে আমরা দেখি সিপাহী শ্রীকে মাতা সম্বোধন করে ঘরে যেতে বলেন। বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে মাঠে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার অপরাধের কথা শ্রী যখন স্বীকার করে তখন সিপাহী তাকে ঐ কথা প্রকাশ্যে বলতে নিষেধ করে। অর্থাৎ এই মুসলমান সিপাহী এক উদার ও প্রজ্ঞাবান মানুষ। তবে এখানেই শেষ নয়। প্রথম সংস্করণের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দুই 'পত্নীসহ' সীতারাম মন্দিরে প্রবেশ করবার পর দেখা যায় সামনে মন্দিরের দেবমূর্তির সামনে একজন মুসলমান বসে আছেন। এই অংশটি আমরা উদ্ধার করে দিচ্ছি। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ফকিরের সঙ্গে সীতারামের এই বাক্যালাপে তা স্পষ্ট হয়েছে। এই আলাপটি দীর্ঘ। তবু আমরা এই প্রসঙ্গে এটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা প্রয়োজন মনে করছি।

"সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিনজনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বাবা তুমি ?

মুসলমান বলিল,

"আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান ?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ।

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল ?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান।

ফকির। দোষ কি বাবা। ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল ?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল ?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর ? ইনি করেন কি ?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্ট করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন ? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দু রাজ্য-স্থাপন করিতে আসিয়াছ ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ? না, আর থাকিবার স্থান আছে ?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন ?

সীতা। অবশ্য তোমরা মান না কেন ?

ফকির। বাবা। ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতি ব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিতে পারিত কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এরূপ আমাদের দেশাচার।"

> ফকির বলল, "বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান, উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজ্য প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ-১৯৫—১৯৭)

প্রথম প্রকাশে এবং পরবর্তীকালে প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশটি রেখেছিলেন। যে 'প্রচার' পত্রিকা হিন্দু বঙ্কিমের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত

সেখানে এ রকম উদার ধর্মদ্বেষহীন সম্মিলনের বাণী শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই সে যুগে উচ্চারণ করতে পারতেন।

'সাম্য' প্রবন্ধের সূত্রধরে এই আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম। সাম্যমতের পরিণতি আছে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তায়। ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে (২৮ অধ্যায়) বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন 'আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়াপ্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।' ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত গুরু শিষ্যের এই সংলাপ থেকে আমরা মানবপ্রেমের যে সুগভীর ব্যাখ্যানে প্রবেশ করি সেখানে আর যাই থাকুক কোন বিদ্বেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মে যা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে তার সূচনা আছে। 'প্রচার'-এর যুগে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্ম ও দর্শনে নিবিষ্ট হলেন তখন থেকে তিনি সেই আবিলতাহীন পথের যাত্রী। তখন থেকেই তিনি অনুভব করলেন 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত।......সর্বভূতে প্রীতি ব্যতিত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।' এই সর্বব্যাপ্ত প্রেমে বঙ্কিমচন্দ্রের যাত্রা শেষ হয়েছে। এই চূড়ান্ত পর্যন্ত অগ্রসর না হয়ে আজও যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের নামে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা নিক্ষেপ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' (২৪ অধ্যায়) থেকে দুটি পংক্তি এই আলোচনার শেষে উদ্ধার করছি—

> 'দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।'

আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ-সব কথা অনুধাবন করতে পারিনি। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষজীবনে হিন্দু মুসলমান মিলনের বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। হিন্দুর মন্দিরে মুসলমান ফকিরের আশ্রয় দিয়ে গেছেন—'তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না।' এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাই বিদ্বেষ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতে হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃত্বের পথিকৃৎ।

সপ্তম অধ্যায়

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

১. দ্র- বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—শ্রীরেজাউল করীম দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ-৫

২. সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী, দ্র- দশ দিকপাল লেখক। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ পৃ-১৯।

৩. দ্র-বঙ্গদর্শন—পৌষ ১২৮০।

৪. রেজাউল করীম মহাশয় এই কথাটি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন—'কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলামধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন? ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ—এ সকলকে কি তিনি কোথাও আক্রমণ করিয়াছেন? হজরত মহম্মদের প্রতি কি তিনি কোথাও অশ্রদ্ধার ভাব দেখাইয়াছেন? ইসলামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতির উপর তিনি কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন? ......ভারতে মুসলমান নৃপতিগণের কয়েকজন, তাঁহাদের শাসন পদ্ধতির কয়েকটি নীতি, সেনাবিভাগে কয়েকজন কর্ম্মচারী, অথবা নবাব বাদশাহের কুমার-কুমারী—ইহারাই তাহার আক্রমণের বিষয়। ইহাদিগকে লইয়া কি সমস্ত ইসলামের কাঠামো রচিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলেই লেখককে ইসলাম-বিরোধী' বলিতে হইবে?'—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬১, পৃ-১১-১২।

৫. বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র—সারোয়ার জাহান।

৬. সেকালের মুসলমান সমাজে বঙ্কিম উপন্যাসের প্রতিক্রিয়া—'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৫ পৃ-৮৬।

৭. দশ দিকপাল লেখক গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ—নারায়ণ চৌধুরী পৃ-১৯

৮. শিলাদিত্য, আগস্ট ১৯৮১

৯. দ্র- প্রাগুক্ত প্রবন্ধ

১০. দ্র- প্রত্যয় ও প্রত্যাশা—ডঃ আহমদ শরীফ। 'বঙ্কিমবীক্ষা : অন্য নিরিখে' প্রবন্ধ

১১. ক. বঙ্কিমচন্দ্র—মণি বাগচী
খ. বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী—ললিতচন্দ্র মিত্র।

১২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত বঙ্কিমপ্রসঙ্গ বইয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধটিতে। লিখেছেন—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃ-৬১-৬২

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র—মণি বাগচী। পৃ-২৮

১৪. দ্র- বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'গৃহে দেবোপম পিতা, দেবী-প্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্ট পল্লীর দেশে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন—প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন ও পূজার দালানে হোম, চণ্ডীপাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, রাস প্রভৃতি বারমাসে তের পার্বণ। ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ।'

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারের কাছে একবার বলেছিলেন—
'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তা থেকে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করে তা হ'ল, জানলে লোকে আশ্চর্য হবে।'—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ সুরেশচন্দ্র।

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়, বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃ-৯১

১৭. ১৯শে নভেম্বর ১৮৩৮ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮। ১৮৫৮ সালে দুজন কলকাতায় সহপাঠী ছিলেন।

১৮. বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করিম, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬১, পৃ-৬। একথাটাও ভেবে দেখবার মতো। ভেদনীতি-দুষ্ট দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার সব থেকে সোজা রাস্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলা। এ কথার প্রমাণ আমাদের চয়ন করা দু-একটি উদ্ধৃতিতেও মিলতে পারে।

১৯. 'বস্তুতঃ যাহাকে ইদানীং Hindu Moslem Solidarity বলি হিন্দু-মুসলমানের ঐ হার্দিক ঐক্য ও আন্তরিক যোগাযোগ ভিন্ন এই খণ্ড ভারতে যে এক মহাভারত স্থাপিত হইতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র এ তথ্য বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' দ্র- দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃ-২৩৪

২০. দ্র- বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করীম, ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্টে সংযুক্ত ডঃ শহীদুল্লাহ-এর বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যমত সম্পর্কিত নিবন্ধ।

২১. সাক্ষরতা প্রকাশন প্রকাশিত বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির চতুর্দিকে আমরা প্রদক্ষিণ করে এলাম। আমরা দেখে এলাম স্বদেশপ্রেমকে তিনি মননের বিষয় থেকে মনের আবেগে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। স্বদেশচিন্তায় আনতে পেরেছিলেন যুক্তির শৃঙ্খলা। বিষয়টিকে করতে পেরেছিলেন সর্বজনবোধ্য, স্পষ্ট ও স্বাদু। বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য, নানা রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব সংযোজিত করেছিলেন। মিশিয়েছিলেন ধর্ম বলতে তিনি যা বুঝতেন তা। এবং শুধু এটুকুও নয়, স্বাজাত্যপ্রেম কোথায় সীমাবদ্ধ, কোথায় আন্তর্জাতিকতার আকাশে মুক্ত, তাও তিনি দেখেছেন। এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে আসা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশচিন্তাকে স্পর্শ করে আসা হয়তো একই কাজ।

তবে এর পরে আমরা একটি শেষতম প্রশ্নের সম্মুখীন হই। প্রশ্ন ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতা কোথায়? স্বদেশপ্রেমের এক উত্তম আবেগ সঞ্চারক এবং নানামুখী স্বদেশচিন্তার এক প্রথম শ্রেণীর সংকলক, এই কি এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়?

বস্তুত তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য রীতির স্বাদেশিকতার বদলে ভারতীয় রীতির স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের নিম্নবৃত্তের মানুষ, দেশের ধর্ম, ইতিহাস, জীবনযাত্রার প্রণালী, উৎপাদনব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সবকিছু বিশ্লেষণ করে আমাদের স্বদেশচিন্তা ও স্বাজাত্যবোধ কি ধরণের হবে তা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝে নেবার এবং বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে গেছেন। আমাদের উপযুক্ত এবং আমাদেরই নিজস্ব একটি স্বাদেশিকতা গড়ে তুলবার কাজে বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁর সমস্ত নির্মাণ, যুক্তি, আবেগ ও সংকলনকর্ম এই লক্ষ্যেই নিয়োজিত ছিল। ইংরেজমতের স্বদেশপ্রেম দিয়ে আমাদের চলবে না একথা বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ভাল করেই বুঝেছিলেন। এবং স্বদেশী স্বদেশপ্রেম, স্বদেশী স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশী স্বদেশচিন্তার ধারা প্রণয়ন করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত বিখ্যাত কবিতায় তিমিররাত্রিতে মশাল হাতের এক যাত্রীকে দেখতে পান। শুধুমাত্র কবির উচ্ছ্বসিত স্তবগান থেকেই

নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তিকে প্রদক্ষিণ করে এসে আজ আমাদেরও ঐ পথপ্রদর্শক যাত্রীকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। চতুর্দিকে সুপ্তি-শয্যায় নিশ্চিন্ত ও ক্লীব দিনযাপনের মাঝখানে, এই শিল্পীর পথনির্মাণের শ্রমের পরিণাম আজ এই স্বাধীনভারতে বসেও আমরা অবশ্যই ভোগ করছি। এই যাত্রীর হস্তধৃত মশালের আলোকবর্ষণের সুফল ভারতবাসী আজও অনুভব করছে। ভবিষ্যতেও করবে:

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিষ্ফলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি,
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি' উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে ন'হে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।*

---

* সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি—'বঙ্কিমচন্দ্র'

নির্ঘণ্ট

র

র

ল

গ্রন্থপঞ্জী

অ—আ

আত্মজীবনী—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দমঠ—বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ ; সাহিত্য পরিষদ

আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উ

উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

ক

করতলে নীলকান্তমণি—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু

কাব্যসংগ্রহ—ঈশ্বরগুপ্ত

কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র—সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

চ

চণ্ডীচরণ সেন—অমিয়ভূষণ বসু

চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র—ভবতোষ দত্ত

ছ

ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনীবিচিত্রা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ

দশ দিকপাল লেখক—নারায়ণ চৌধুরী
দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
দেশ—সাহিত্য সংখ্যা (১৩৭৪)

ন

নবযুগের বাংলা—বিপিন চন্দ্র পাল
নবনূর—বৈশাখ ১৩১২ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

প

প্রবন্ধসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী
প্রবন্ধাবলী—অক্ষয়কুমার দত্ত
প্রচার—১২৯১, শ্রাবণ
প্রবন্ধাবলী (প্রথম খণ্ড)—শিবনাথ শাস্ত্রী
প্রত্যয় ও প্রত্যাশা—ডঃ আহমদ শরীফ

ব

বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ
বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ—গোপাল হালদার সম্পাদিত, সাক্ষরতা প্রকাশন
বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্কিমচন্দ্র—মণি বাগচী
বঙ্কিমচন্দ্র—(জীবন ও সাহিত্য)—গোপালচন্দ্র রায়
বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধ সেনগুপ্ত, তৃতীয় সংস্করণ
বঙ্কিম প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—শ্রী শিবানন্দ, প্রথম প্রকাশ-১৩৫৭
বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বভারতী
বঙ্কিমবরণ—মোহিতলাল মজুমদার
বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়—কবিশেখর কালিদাস রায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ
বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতচিন্তা সূত্রে ও প্রকৃতি—ডঃ জীবেন্দু রায়
বঙ্কিম সরণী—শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ব

বঙ্কিমমানস—অরবিন্দ পোদ্দার

বঙ্কিম সাহিত্য—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী—ললিতচন্দ্র মিত্র

বঙ্কিম উপন্যাসের মুসলমান প্রসঙ্গ ও চরিত্র—সারোয়ার জাহান

বঙ্কিম দীক্ষা অন্য নিরিখে—আহমদ শরীফ

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করীম

বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম পর্ব)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর ইতিহাস— নীহাররঞ্জন রায়

বিদ্যাসাগর পরিচয়—যোগেশচন্দ্র বাগল

বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ—শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

ভ

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

ভূদেব রচনাসম্ভার—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

ম

মধুসূদন রচনাবলী—সাহিত্য সংসদ

মনুসংহিতা

মহুয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র

রাজনারায়ণের কলকাতা—অমরেন্দ্র দাস

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

শ

শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ

শিশু সাহিত্য—অগাষ্ট, ১৯৮১

স

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যসাধক চরিতমালা—যোগেশচন্দ্র বাগল

Annals of Rural Bengal (1860)—W. W. Hunter.

British Paramountcy and Indian Renaissance—
R. C. Majumder, Part-I, (1963)

Conversation of Gothe with Ecker Mann—
Everyman's Library Edition.

Modern India—Sumit Sarkar.

Nationalism Its Meaning and History—Hans Kohn.

Nationalism in Asia—R. S. Chavan.

Notes on Indian History—K. Marx.

Raja Rammohan Roy—Sri Prabhat Chandra Ganguly and
Prof. Dilip Kumar Biswas, (1962).

Rise and Fulfilment of British rule in India—Edward
Tomson and T. Garret.

Selected Essays—T. S. Eliot.

Shivaji and His Time—Jadunath Sarkar, Orient Longman.

The New Encyclopaedia—Britanica, Vol. 17, 1979.

The English Works of Rammohan Roy—Part-IV, 1947.

The Father of Modern India—Part-II, 1933.

The Hour of God and other Writings—Sri Aurobindo,
Vol. 17.

Vasudeo Balavant Phadke, (1959), V. S. Joshi.*

* এ ছাড়া কিছু সাময়িকপত্র ও প্রবন্ধাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে যার উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	যা আছে	যা হবে
৩৬	বৈশিষ্ট্যঃ	বৈশিষ্ট্য
৫১	বেশী	বেশি
৫২	করেছিলন	করেছিলেন
৫৭	তৃকি	তুর্কি
৬৮	হান্টারের	হান্টারের
৮০	কুমারসম্ভাবমের	কুমারসম্ভবমের
৯২	কাঙ্খিত	কাঙ্ক্ষিত
৯৩	”	”
৯৪	”	”
৯৬	”	”
১৩০	শুনিয়াছেন	শুনিয়েছেন
১৩৪	শাহাবাহু	শাহবাহু

———